দাম : পাঁচ টাকা

স্বস্তিকা

১৯ সেপ্টেম্বর - ২০১১, ১ আশ্বিন - ১৪১৮ ।।
৬৪ বর্ষ, ৫ সংখ্যা

রাজধানীর বুকে বিস্ফোরণ

চিৎপুরের যাত্রাপালা একাল-সেকাল

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑
সংবাদ প্রতিবেদন ❑
বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম বিদায় না হলে সি পি এম আবার ভেঙে যাবে ❑
কবর খুঁড়ে বার করা হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমন বিলটি ❑
শক্তিশালী হিন্দু-দরদী প্রচারমাধ্যম দরকার ❑ ডঃ স্বরূপ ঘোষ ❑
বারুদের স্তূপের ওপর করাচী ❑ মুজফফর হোসেন ❑
চিৎপুরের যাত্রাপালা এবার মমতাময় ❑ বিকাশ ভট্টাচার্য ❑
যাত্রাপালার ঐতিহ্যমণ্ডিত পরম্পরা আজ কতটা বজায় রয়েছে? ❑
দেবাদিত্য চক্রবর্তী ❑
খোলা চিঠি : মনমোহন সিংজী, অপরের অসততাকে প্রশ্রয় দিলে
চাপে তো পড়তেই হবে ❑ সুন্দর মৌলিক ❑
পর্যটকের চোখে : ইউরোপের দেশে দেশে— ইতালি,
সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী, পর্ব — ১ ❑ হিতেন্দ্র কুমার ঘোষ ❑
সতীর স্থানে কলকাতার প্রথম সর্বজনীন দুর্গোৎসব ❑ নির্মল কর ❑
বনেদী বাড়ির পুজোয় বাড়ির মহিলারা ❑ বিদিশা ভট্টাচার্য ❑
বোল্ট যেন বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুতগামী ❑ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑
মোটরবাইক তুমি কার? গতির, না দুর্গতির? ❑ রমাপ্রসাদ দত্ত ❑
নিয়মিত বিভাগ
এইসময় : ❑ অন্যরকম : ❑ উত্তর-পূর্বাঞ্চল : ❑
চিঠিপত্র : ❑ সমাবেশ-সমাচার : ❑ শব্দরূপ : ❑ চিত্রকথা :

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

চিৎপুরের যাত্রাপালা

একাল-সেকাল — ১৫-১৭

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ১ আশ্বিন, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৩, ১৯ সেপ্টেম্বর - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail :
swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দেশের জমি বাংলাদেশকে উপঢৌকন কেন?

ছিটমহল সমস্যার সমাধানের নামে একটি গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশের সরকার তাহার নিজের দেশের জমি অন্যকে উপঢৌকন দিতেছে এই রকম ঘটনা কখনও ঘটে নাই। কিন্তু যেহেতু বর্তমান ভারতবর্ষে কেন্দ্রে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত অযোগ্য দল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছে তাই তাহাদের পক্ষে সমস্ত কিছুই সম্ভব। আগামী দিনে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হাতে তুলিয়া দিলে অবাক হইবার কিছু থাকিবে না। অসমের ৬৬৫ একর জমি বাংলাদেশের হাতে তুলিয়া দিবার সাফাই হিসেবে অসম ও মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় বলিয়াছেন, যে জমি কার্যত বহু আগেই হাতছাড়া হইয়াছে এবং ভারতের কাজে লাগিতেছে না— সে কারণেই নাকি বাংলাদেশকে দেওয়া হইয়াছে। বিরোধী দলগুলি তাহা লইয়া অকারণে অশান্তি তৈরি করিতেছে। মনে হইতেছে দেশের জমি ইউ পি এ সরকারের পৈত্রিক সম্পত্তি, তাহারা তাই দেশের জমি যে কাহাকেও উপঢৌকন দিতে পারেন। এই বিষয়ে কেহই প্রতিবাদ করিতে পারিবে না। উল্লেখ্য, ভারত চীন যুদ্ধের দেশের বিস্তৃত ভূখণ্ড চীন দখল করিয়া লইলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুও এমন বালখিল্য কথা বলিয়াছিলেন। নেহরুর কথায় একটি ঘাসও যেখানে জন্মায় না সেই জমিখণ্ড কেহ দখল করিয়া লইলে হতাশ হইবার কী আছে? অন্য কোনও দেশ হইলে এমন দেশদ্রোহীদের নিশ্চিত ফাঁসিতে লটকানোর ব্যবস্থা হইত। কিন্তু যেহেতু দেশটির নাম ভারতবর্ষ সেইহেতু এইদেশে এখন স্বাধীনতা সংগ্রামী হইতে দেশদ্রোহীদের কদর বেশি। নেহরু বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম বসুকে 'টেররিস্ট' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরসূরীরা সংসদ আক্রমণকারী সন্ত্রাসবাদী আফজল গুরুকে শহীদের মর্যাদা দিবার কথা ভাবিতেছেন।

যে বাংলাদেশকে এত ঔদার্য দেখানো হইতেছে সেই বাংলাদেশ সরকারের অসহযোগিতার জন্য ভারত মায়নামারের কাছ হইতে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির পরিকল্পনা এখন সুদূর অতীত। মায়নামার হইতে ভারতে গ্যাস আমদানির জন্য পরিকল্পিত পাইপলাইনটি যেহেতু বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে আসিয়া উত্তর-পূর্ব ভারতে ঢোকার কথা ছিল, বাংলাদেশের আপত্তিতে তাহা সম্ভব হয় নাই। তৎপরিবর্তে মায়নামারের সঙ্গে চীনের আগামী ত্রিশ বছরের জন্য গ্যাস সরবরাহের চুক্তি ইতিমধ্যেই স্বাক্ষরিত হইয়াছে। পরিতাপের বিষয় মায়নামারের যে গ্যাসফিল্ড থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের জন্য বলা হইয়াছিল ওই ব্লকের কুড়ি শতাংশের অংশীদার ভারতের রাষ্ট্রীয় সংস্থা 'তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন' এবং দশ শতাংশের অংশীদার 'গ্যাস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড'। প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশকে যে মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রতিদান বাংলাদেশ কখনও দেয় নাই।

দুই দেশের মধ্যে ছিটমহল সমস্যার সমাধান এই সফরের ফলে হইবে বলিয়া যাহা বলা হইতেছিল, কার্যত তাহা হয় নাই। তিনবিঘা এলাকার মানুষরা আবার আন্দোলনে নামিবে বলিয়া সংগঠিত হইতেছে। বাংলাদেশী ছিটমহলের ভারতীয়রা তাহাদের ভারতীয় পরিচয়পত্রের জন্য আন্দোলন করিতেছে। অর্থাৎ সুষ্ঠু সমাধান এখনও হয় নাই।

সরকার বাংলাদেশকে জমি বিতরণ করিতেছে কিন্তু কাহারও সহিত কোনওরূপ আলোচনা করে নাই। সমস্ত কিছু হইয়াছে গোপনে। সরকারের এই গোপনীয়তা কেন? তিস্তা জল চুক্তির ক্ষেত্রেও গোপনীয়তা ছিল বলিয়াই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই চুক্তিতে বাধাদান করিয়াছেন। দেশের মানুষের কাছে সমস্ত বিষয় গোপন করিয়া বাংলাদেশের সহিত সম্প্রীতি স্থাপন সম্ভব নয়। ক্রমাগত বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের ফলে অসম ইতিমধ্যেই মিনি বাংলাদেশ হইয়া গিয়াছে। ইহার পর বাংলাদেশকে অসমের জমি উপঢৌকন দিলে আগামীদিনে কী ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করিতেছে তাহা বুঝিতে অসুবিধা হইবার কথা নয়। অসমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-বিজেপি-অগপ সহ সমস্ত দল ইতিমধ্যেই বাংলাদেশকে ভারতের জমি উপঢৌকন দিবার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বোধবুদ্ধিহীন সরকারের বোধোদয় হইবে কি?

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্ব ভূ-ভাগের হয়ে সত্য সাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধন-সম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধন-সম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর মহলে তার আসন পড়বে। কিন্তু আমি বলি, এই মান-সম্মানের কথা এও বাহিরের, একেও উপেক্ষা করা চলে। এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে, কোনও সুবিধার জন্য নয়, সম্মানের জন্য নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশ তত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তাহলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব— নবযুগের উদ্বোধন করে আমরা জরামুক্ত হব।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সীমান্ত সমস্যা সমাধানের নামে বাংলাদেশকে মনমোহনের ভারত ভূখণ্ড উপঢৌকন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বাংলাদেশ সফর শেষে ফিরে এসেছেন। সঙ্গী অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী মুকুল সাংমাও ফিরেছেন। সীমান্ত সমস্যা সমাধানের নামে বাংলাদেশকে যে জমি উপঢৌকন দিয়ে এলেন তাতে শুধু ছিটমহলের অধিবাসীরাই নয়, সারা দেশই উদ্বিগ্ন। যাদের জমি দিলেন তাদের অবস্থান, তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথাটা একবারও ভেবে দেখা হলো না। সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করিমগঞ্জ জেলাবাসীরা। সফরের আগে ও পরে অসম-মেঘালয় জুড়ে কেন্দ্র ও রাজ্য-সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনরোষের প্রকাশ হয়েছে এবং হচ্ছে। গত ৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাকে সাড়া দিয়ে অসমে সর্বাত্মক বন্ধ হয়েছে। কুশপুত্তলিকা দাহ হয়েছে মনমোহন এবং তরুণ গগৈ-এর।

করিমগঞ্জে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনেক ক্ষেত্রেই কাঁটাতারের বেড়ার কাজ হয়নি অথবা দায়সারাভাবে সারা হয়েছে। ফলে নিত্য নিয়মিত বাংলাদেশী দুর্বৃত্তদের ডাকাতি-রাহাজানি, ফসল কেটে নিয়ে যাওয়া এবং অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়, মুক্তিপণ নিয়ে দরকষাকষি করলে বা কম দিতে চাইলে জোর-জবরদস্তিতে নিষিদ্ধ গোমাংস খাওয়ানোর ঘটনা কোনও নতুন নয়। এছাড়া বাংলাদেশ সীমান্তের ভারতীয় চা-বাগানগুলোও বাংলাদেশী দুর্বৃত্তদের অত্যাচারে বন্ধ অথবা বন্ধ হতে বসেছে। ২০০৩ সালে হিন্দু ব্যবসায়ী বিধান দাস এবং প্রমোদনগর চা বাগানের মারোয়াড়ী ম্যানেজারকে নিজেদের বাসস্থান ও চা-বাগানের কোয়ার্টার থেকে বাংলাদেশী মুসলমান দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়েছিল। বিশাল পরিমাণ মুক্তিপণের বিনিময়ে এবং গোমাংস খাওয়ানোর পরই ছেড়েছিল। এই ঘটনার প্রতিবাদে বজরং দলের নেতৃত্বে হিন্দুরা প্রতিবাদস্বরূপ বাংলাদেশে অভিযানের ডাক দিয়েছিল।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্র সরকার করিমগঞ্জ জেলাশাসক-এর পাঠানো ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কিত প্রতিবেদনকেও কোনও গুরুত্বই দেয়নি। গত ২০ আগস্ট তিনি নিজেই সীমান্ত পরিদর্শন করে তাঁর অভিমত জানিয়েছিলেন। তাঁর কথা ছিল, আন্তর্জাতিক চুক্তি অমান্য করে ন্যাশনাল বিল্ডিং কন্স্ট্রাকশন কোম্পানী লিমিটেড (NBCC) এবং ন্যাশনাল প্রজেক্টস্ কন্সট্রাকশন কোম্পানী লিমিটেড (NPCC) ফাঁকি দিয়ে বেড়া দেওয়ার কাজে ফাঁক-ফোকর রেখে গেছে এবং তা আক্ষরিক অর্থেই।

করিমগঞ্জ জেলার সঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্তের দৈর্ঘ্য হলো ১০৫.৬৬ কিলোমিটার। তার মধ্যে ৩৫.৮ কিমি এলাকায় নদীই সীমানা চিহ্নিত করছে। ২০০৯-এর ২৯ নভেম্বর নতুন দিল্লীতে দু'দেশের স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকে ঠিক হয়েছিল— জিরো লাইনের ১৩৭ মিটার ভারতীয় এলাকার ভিতরে কাঁটাতারের বেড়া হবে। যেখানে তা সম্ভব নয়, অর্থাৎ বাড়ীঘরই বর্ডার। সেক্ষেত্রে সিঙ্গল লেয়ার বেড়া হবে। এই নিয়ম বেড়া দেওয়ার সময় মানাই হয়নি।

সদ্য সমাপ্ত সফরে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে মূলত তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ফলে অসমের প্রায় ৫০০ একর ভারত ভূখণ্ড বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির সময় দেশভাগের সময়কার র‍্যাডক্লিফ লাইনকেই প্রামাণ্য ধরে ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল। তবে তাতে দু'দেশের মানুষেরই আপত্তি ছিল। মেঘালয়ের পীরদোয়া, মুক্তাপুর, ডাউকি, তামাবিল এবং অসমের ডুমাবাড়ি-লাঠিটিলা, বরইবাড়ি সীমান্ত গ্রামে বি এস এফ এবং বি ডি আর-এর মধ্যে বারবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ২০০১-এ বরইবাড়িতে সীমান্ত-চৌকি দখলে রাখতে গিয়ে ১৬ জন বি এস এফ জওয়ানকে বি ডি আর তুলে নিয়ে যায়, পরে কচুকাটা করে তাদের মৃতদেহ ফেরৎ দেয়। সেই নৃশংস হত্যার ছবি এদেশের বহু কাগজেই প্রকাশিত হয়েছিল। গত বৎসর মেঘালয়ের মুক্তাপুরে দু'দেশের মধ্যে গুলি চলেছে কমপক্ষে ছ'বার। গ্রামবাসীরা মারা গেছে। বি ডি আর-এর গুলিতে কাছাড় জেলাতেও বাংলাদেশ সীমান্তে গ্রামবাসীদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া অনুপ্রবেশ, সীমান্তগ্রামে চাষ-আবাদ ও নদীতে মাছধরা নিয়ে দু'দেশের মানুষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা তো নিয়মিত। গত ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালের চুক্তির (যে চুক্তি বর্তমানে মেয়াদ উত্তীর্ণ) ১৫নং দফা কার্যকর করে করিমগঞ্জ জেলার ডুমাবাড়ি-লাঠিটিলা এবং ধুবড়ি জেলার মানকাচারের তথাকথিত বিতর্কিত বলে খ্যাত বরইবাড়ি বাংলাদেশকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাউকি-তামাবিলের বর্তমান সীমান্তরেখা বরাবর সোজাসুজি লাইন টানা হচ্ছে। সব মিলিয়ে পীরদোয়ার ২২০ একরের মধ্যে ১৯৩ একর পাচ্ছে ভারত। লিংখাতে ৬ একরের মধ্যে ৪.৭৫ একর পড়ছে ভারতের ভাগে। গ্রামবাসীরা এই চুক্তি মানবেন না বলে জানিয়েছেন। তাঁরা রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপ দাবী করছেন বলে জানা গেছে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান এম রিংসাই-এর অভিযোগ— মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী মুকুল সাংমা যারা জমির প্রকৃত মালিক, তাদের সঙ্গে কথা বলার দরকার মনে করেননি। উলফা'র (ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ অসম) কট্টরপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুসরণ করে রাজ্যের স্বার্থরক্ষায় আন্দোলনের ডাক দিয়েছে।

মুর্শিদাবাদে বন্যায় নদী ভাঙন

দেশবাসীর সর্বনাশ, পাচারকারীদের পৌষমাস

তরুণ কুমার পণ্ডিত : মালদা ॥ মালদা জেলার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা থানার সাঁকো পাড়াতে গত তিন বছর ধরে গঙ্গার ভাঙনে হাজার হাজার বিঘে জমি গঙ্গায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অথচ সরকারী ত্রাণ ও গঙ্গার পাড় বাঁধানোর কোনও ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। ফরাক্কা পার হয়ে ধুলিয়ানের গঙ্গা এখনও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে রয়েছে। গঙ্গা জলে সেখানকার পারলালপুর, পরে অনুপনগর গ্রাম দুটি এখনও মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। স্থানীয় কৃষকেরা হলুদ, ধান, পাট, দামী মেহগনী ও সেগুন বাগানের জমি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে। গত ১ সেপ্টেম্বর সেখানের মানুষদের দুর্দশার খবর পেয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবা বিভাগের পক্ষ থেকে একটি দল কিছু ত্রাণ সামগ্রী

বন্যায় নদীভাঙনে মুর্শিদাবাদের

নিয়ে সেই দুর্গম অঞ্চলে রওনা হয়। নৌকা করে সেই গ্রামে পৌঁছে দেখা যায় বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ জলবন্দী অবস্থায় রয়েছে। তাদের ত্রিপল, চিড়া ও গুড় বন্টন করা হয়। সামান্য ত্রাণ হলেও সঙ্ঘের এই প্রচেষ্টাকে তারা স্বাগত জানান। যেহেতু এলাকাটি বন্যা কবলিত সেইজন্য সরকারি ভাবে যে ত্রাণ বন্টন হয়েছে তাতে বেশ কিছু মানুষ ত্রাণ সামগ্রী থেকে বঞ্চিত ছিল। স্বয়ংসেবকদের এই সামান্য ত্রাণ তাদের সাহায্য করেছে বলে গ্রামবাসীরা জানান।

গঙ্গার করাল গ্রাসে কীভাবে হাজার হাজার বিঘে জমি তালিয়ে যাচ্ছে তা দেখানোর জন্য নৌকা করে তারা স্বয়ংসেবকদের নিয়ে যায়। গঙ্গা ভাঙনের সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। চোখের সামনে হলুদ ও ধানের জমি গঙ্গার প্রবল স্রোতে ধসে পড়ছে। অনুপনগরের ঘোষ পাড়ার আনন্দ মণ্ডল হতাশভাবে জানালেন— ''তাদের ৬ বিঘে পটলের জমি ছিল। এই গঙ্গার বানে সব ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে। এখন আমি কীভাবে বেঁচে থাকব? বাড়িতে ছেলেপুলে নিয়ে সাতজনের সংসার। এই জমিটুকুই আমার একমাত্র সম্বল ছিল।'' চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম— বি ডি ও অফিসে গিয়ে বাবুদের জানাওনি? 'জানিয়েছিলাম, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। জমি কী আর কেউ দিতে পারবে বাবু'?

আরও এক বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। দেখলাম, কয়েকজন লোক ৬-৭টি গরুর বাছুরকে চোখ বেঁধে নৌকাতে ওঠাচ্ছে। বাছুরগুলির বয়স ১০-১১ মাসের বেশী হবে না। স্থানীয় মানুষদের জিজ্ঞেস করলে তারা যা বললেন তা খুবই বেদনাদায়ক। এই বাছুরগুলিকে নৌকো থেকে প্রচণ্ড স্রোতের মুখে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। আর বাছুরগুলি ভাসতে ভাসতে বাংলাদেশে চলে গেলে মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে তাদের বিক্রি করে দেওয়া হবে অর্থাৎ পাচার হয়ে গেল। বাছুরগুলির গায়ে গোল গোল ছাপ দেওয়া ছিল যা সাংকেতিক চিহ্ন। এইভাবে কত গরু যে প্রতিদিন বাংলাদেশে নদীপথে পার হয়ে যাচ্ছে তার হিসেব নেই। কত গরু নদী স্রোতের মুখে মারাও পড়ে। প্রশাসন সব জেনে শুনে মুখে কলুপ এঁটেছে। নদীপথে গরু পাচার হওয়ার এই প্রক্রিয়া সারা বছর চললেও বর্ষার সময়ে তা বেড়ে যায়। সব মিলিয়ে হিন্দুরা জমির ফসল হারিয়ে পথে বসেছে আর এক শ্রেণীর মুসলিম দুষ্কৃতী দেশের গো-সম্পদ বিদেশে পাচার করে মুনাফা লুঠছে।

দুর্নীর্তির বিরুদ্ধে রথযাত্রায় আদবানী

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আবার রথযাত্রায় বের হচ্ছেন ভারতীয় জনতা পার্টির শীর্ষনেতা তথা ভারতের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী। স্বচ্ছ রাজনীতি এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের লক্ষ্যে এবং কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ইউ পি এ সরকারের দুর্নীতি দমনে নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যর্থতা তুলে ধরতেই তাঁর এই রথযাত্রা। গত ১১ সেপ্টেম্বর বিজেপির কোর গ্রুপের বৈঠকে যাত্রার ব্যাপারে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ও স্থির হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। এখনও পর্যন্ত যা স্থির হয়েছে সেইমতো রথযাত্রা ১১ অক্টোবর দুর্গাপুজোর পর শুরু হয়ে ২০ নভেম্বর শেষ হবে। বিজেপি নেতা অনন্ত কুমার এই যাত্রার সংযোজকের দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানা গেছে। কোরগ্রুপের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি' সভাপতি নীতিন গডকরি, লোকসভার বিরোধী দলনেত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা অরুণ জেটলি, বাল আপ্তে, অনন্তকুমার প্রমুখ প্রথম সারির নেতারা। যাত্রাপথ হবে প্রায় ৬০০০ কিলোমিটার। যেসব রাজ্যে আগামী বছর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন সেই সকল রাজ্যের মধ্য দিয়েও রথযাত্রা হবে।

৮৩ বছর বয়স্ক আদবানীজীর এই বিরাট যাত্রার ঘোষণায় অনেকে বিস্মিত হলেও যাত্রা হচ্ছে। প্রচার মাধ্যমে এনিয়ে মনগড়া অনেক গাল-গল্প চললেও শ্রী গডকরি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, নির্বাচনের (২০১৪) পরই দল নেতা নির্বাচন করবে। বস্তুত 'রথযাত্রা' ঘোষণার দিনই শ্রীআদবানী জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এর সঙ্গে নির্বাচনের কোনও সম্পর্ক নেই। দুর্নীর্তির বিরুদ্ধেই এই রথযাত্রা।

যাত্রাপথের রূপরেখা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। প্রসঙ্গত, ১৯৯০ সালের রামরথ যাত্রা (সোমনাথ থেকে অযোধ্যা) আদবানীজী এবং দলকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিল। এর আগে শ্রী আদবানী সাতবার রথযাত্রায় বেরিয়েছেন। রথযাত্রা ভারতীয় পরম্পরার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সেইসঙ্গে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করা যায়। একথা মাথায় রেখেই দুর্নীর্তির বিরুদ্ধে এই রথযাত্রা রাম রথযাত্রার মতো দেশের মানুষকে উদ্বেল করে কিনা সেটাই এখন দেখার।

রাজ্য রাজনীতি

বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম বিদায় না হলে সিপিএম আবার ভেঙে যাবে

নিশাকর সোম

স্লোগান দিতে ইচ্ছে করছে— উইকিলিকস-এর জয় হোক। এদের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন নেতা-নেত্রীর কথাবার্তা আচার-আচরণ ফাঁস হচ্ছে। এইসব নেতা-নেত্রীদের উপরটা চাকন-চিকন, ভেতরে খড়ের গাদন। যে পার্টি কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছিল, আমেরিকার সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তির জেরে, সেই পার্টি অর্থাৎ সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ২০০৯ সালে ১৩ অক্টোবর ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত টিমোথি রোমারকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, পার্টি যদি পুরানো ধ্যান-ধারণা ত্যাগ না করতে পারে তবে পার্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার ভূয়সী প্রশংসাও করেছিলেন!

এই সাক্ষাৎকারের কথা উইকিলিকস ফাঁস করে দেওয়াতে বুদ্ধবাবুর হয়ে সাফাই গাইলেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত। কারাতের বক্তব্য হলো— বুদ্ধদেব সঠিক কথাই বলেছেন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পার্টির কর্মসূচীকেও পরিবর্তন করতে হয়। সিপিএমের আগামী পার্টি কংগ্রেসে যে আদর্শগত দলিল পেশ করা হবে, তাতে সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধন করে বিশ্বায়নের তালে তাল মিলিয়ে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের গুণগান করা হবে কি? সিপিএমের সঙ্গে বিদেশী কূটনৈতিকদের হব-নব দীর্ঘকালের। ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট সরকার রাজপাটে বসার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন কনসাল, বৃটিশ কনসাল, বহু বিদেশী সাংবাদিকদের আলিমুদ্দিনে আনাগোনা শুরু হয়। জ্যোতি বসু-প্রমোদ দাশগুপ্তরা সানন্দে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেন। বিশ্ব ব্যাঙ্কের কর্তা রবার্ট ম্যাকনামারাকে মহাকরণে মহাআদরে জ্যোতি বসু সানন্দে অভ্যর্থনা করেছিলেন। ম্যাকনামারাকে এক সময়ে মার্কিন দেশে অত্যাচারী বলা হোত। অথচ কারাত অ্যান্ড কোং ইউপিএ সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করতে গিয়ে বলেছিল--- ‘‘আমেরিকার সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তির বিরোধিতার জন্য সমর্থন প্রত্যাহার করা হলো।’’

অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সময়ে জনৈক প্রাক্তন ছাত্র-নেতা তথা পরে সাংবাদিককে সি আই এ-এর এজেন্ট বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। শোনা যায়, এ সম্পর্কে তাঁর ভাইও পার্টির পক্ষে ছিলেন। এছাড়াও নকশাল আন্দোলনের বিরুদ্ধে সিপিএম নেতারা ‘সি আই এ-এর এজেন্ট’ বলে চিহ্নিত করেছিলেন উত্তরবঙ্গের ‘জনৈক নন্দাকে’। বর্তমানে সিপিএম একটি ধনিক-বণিক-সাম্রাজ্যবাদী পোষক দলে পরিণত হয়েছে। অথচ এরাই আবার এন ডি এ সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা করেছিল।

সিপিএমের মধ্যে পার্টি কংগ্রেসের আগে অনেক বিক্ষুব্ধ তৈরি হবে। তাঁদের একাংশ মাওবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করবেন। শুধু তাঁরাই নয়, ধীরে ধীরে ‘না-পাওয়া’ তৃণমূলের একাংশও মাওবাদী হবেন। ইতিমধ্যে জঙ্গলমহলে নানা গণসমিতির নাম করে সংগঠিত হচ্ছে মাওবাদীরা।

এছাড়া আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর এক সম্মেলন হতে চলেছে। তাতে উপস্থিত থাকবেন দীপঙ্কর ভট্টাচার্য পরিচালিত সি পি আই এল (লিবারেশন) গোষ্ঠী, সন্তোষ রাণার গোষ্ঠী এবং বিক্ষুব্ধ সিপিএমের মার্কসবাদী মঞ্চ। এই সম্মেলন থেকে বাম সমন্বয় কমিটি গঠন করে বাম সংগ্রামী বিকল্প’ তৈরি হবে। এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন দলের বহিষ্কৃত নেতা আলোক নন্দী এবং দার্জিলিং-এর অপসৃত নেতা তারামণি রাই। এই সম্মেলনে সব থেকে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি হলো বিতর্কিত সিপিএম-নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা। এর পিছনে আর এস পি দলের মদত আছে এবং শেষমেশ তাঁরাও যোগ দিতে পারেন।

একথা বলা যায় যে, বুদ্ধ-বিমান-নিরুপমকে অপসারণ না করা হলে অদূর ভবিষ্যতে সিপিএমের ভাঙন প্রতিরোধ করা যাবে না। বিপরীতে সংসদে পেশ করা ক্যাগের তিনটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত এয়ার ইন্ডিয়ার ১১১টি বিমান কেনা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সেনা এবং বায়ুসেনাদের জন্য সামরিক রসদ। হেলিকপ্টার, গোলাবারুদ কেনা এবং মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স সংস্থাকে অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকায় গ্যাস আহরণ প্রভৃতি ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের বহু আর্থিক অনিয়ম সামনে এসে গেল। সর্বোপরি দিল্লী হাইকোর্টের সন্ত্রাসবাদীদেব আক্রমণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তথা চিদাম্বরম-এর বিরুদ্ধে বিপুল বিক্ষোভ উঠেছে। এরই পাশাপাশি বিজেপি নেতার রথযাত্রা জাতীয় রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা এনে দেবে।

তিস্তা-চুক্তি নিয়ে মমতা ব্যানার্জির সিদ্ধান্তকে বিজেপি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু সিপিএম-সিপিআই বহু প্রশ্ন তুলেছে। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্যামল চক্রবর্তীর বক্তব্য হলো— ‘‘প্রথমে আপত্তি না করে, চুক্তি যখন দোরগোড়ায় তখন না বলাটায় দেশের মুখ পোড়ানো হলো।’’ সিপিআই সাংসদ-নেতা গুরুদাস দাশগুপ্ত বলেছেন— ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পদক্ষেপ কোনও ইতিবাচক বার্তা দেবে না। এই সিদ্ধান্ত দেশের রাজনৈতিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় রেওয়াজের পরিপন্থী।’’ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন বলে সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও রাজ্যে ক্ষমতায় টিকে থাকবে তৃণমূল-কংগ্রেস জোট সরকার। কিন্তু তৃণমূল-কংগ্রেস-এর সংঘর্ষ হচ্ছে। তৃণমূলের বিধায়ক থানা থেকে বন্দিকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে।

পাঁচলার তৃণমূল বিধায়ক গুলশন মল্লিক ফ্রাউন্ড্রি পার্কের জন্য জমি বিক্রি করেছেন নিজেদের কেনা জমি থেকে। যাতে ফ্রাউন্ড্রি পার্কের কাজে শিল্পপতিদের কোনও অসুবিধা না হয়।

ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার বার্লে মহাকরণে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। বিশ্ব ব্যাঙ্কের ৩০০ কোটি টাকায় দীঘা-কে গোয়া করা হবে। গঙ্গার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে টেমস নদী করার জন্য ২৫ কোটি টাকা মূল্যের মেশিন আসছে। কলকাতাকে এশিয়ান ডেভলাপমেন্ট ব্যাঙ্কের টাকায় সাজানো হবে। এদিকে যখন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মন্ত্রীদের ঘর সাজানো হচ্ছে, মন্ত্রী বিধায়কদের বেতন-ভাতা দিতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে, ঠিক তখনই বিদ্যুৎ কর্মীদের পূজা এক্সগ্রাসিয়ার হ্রাস করার বিরুদ্ধে তৃণমূলসহ সব দলের কর্মীরা বিক্ষোভ জানাচ্ছেন এবং প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, মন্ত্রীদের রিপোর্টকে সরেজমিনে ‘চেক-আপ’ করার জন্য তিনি পুজোর পর জেলায় জেলায় উন্নয়নের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন।

রাজ্যে এখনও রাজনৈতিক সংঘর্ষ বন্ধ হয়নি, তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ বেড়ে গেছে। মাওবাদীরা জঙ্গলমহল থেকে তাদের সংগঠন বিস্তার করেছে ওড়িশা-অন্ধ্র-ঝাড়খণ্ডে। রাজ্যে জঙ্গিহানারও সতর্কবার্তা রয়েছে। রাজ্যের ভবিষ্যত কি? এটাই আজ বড় প্রশ্ন? এরাজ্যে আর্থিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হবে কি?

কবর খুঁড়ে বার করা হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমন বিলটি

গূঢ়পুরুষের কলম

দেশজুড়ে মন্ত্রী, নেতা ও তাদের সাগরেদ কিছু আমলাদের দুর্নীতি ও দৌরাত্ম্যের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে প্রতিবাদী আন্দোলন যখন দানা বাঁধছে ঠিক তখনই আন্দোলনের অভিমুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমন বিলটিকে কবর খুঁড়ে বার করা হয়েছে। এই বিলটি গত তিন বছর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আলমারিতে ফাইল-বন্দি ছিল। দাঙ্গা দমন বিলটির পুরো নাম, ''প্রিভেনশন অফ্ কম্যুনাল অ্যান্ড টারগেটেড ভায়োলেন্স বিল, ২০১১।'' বিলটির খসড়া প্রস্তুত করেছে সোনিয়া—মনমোহনের সৃষ্ট 'ন্যাশানাল অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল'। উদ্দেশ্য, মুসলিম ও দলিতদের ভোট কংগ্রেসের পকেটে পোরা। এর জন্য প্রয়োজনে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস নেতারা কতদূর যেতে পারেন তার নিকৃষ্ট উদারণ এই বিলের খসড়ার ছত্রে ছত্রে লেখা আছে। যেমন, বিলের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য সংখ্যাগুরু হিন্দুরাই দায়ী। অথবা হিন্দুদেরই দায়িত্ব নিতে হবে। শাস্তি পেতে হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষই দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই তারা দাঙ্গা লাগাতে পারে না। বিলের শুরুতেই যদি এমন একতরফা উস্কানি থাকে তবে এর উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় না। সারা দেশে একমাত্র বিজেপি বিলটির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ এনেছে। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, গুজরাতের মানুষকে শায়েস্তা করতেই কংগ্রেস এই বিলটিকে আইনে পরিণত করতে চায়। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাঙ্গা বিরোধী বিলটির বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু সে অন্য কারণে। মমতার বক্তব্য, দাঙ্গা দমনের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। সংবিধানের ৩৬৫ ধারায় বলা হয়েছে, রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। রাজ্য চাইলে কেন্দ্র শান্তি রক্ষায় সাহায্য সহযোগিতা করবে। কিন্তু প্রস্তাবিত বিলে বলা হয়েছে— সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রতিরোধের দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রের হাতে। কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়ে দাঙ্গা দমনের জন্য কেন্দ্রকে রাজ্যের আগাম অনুমতি নিতে হবে না। রাজ্যকে অন্ধকারে রেখেই কেন্দ্র আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে নিতে পারবে। মমতার আপত্তি ঠিক এখানেই। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দাঙ্গাবাজ বলে চিহ্নিত করার জন্য নয়।

প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় দাঙ্গা দমন বিলের খসড়ায় কী বলা হয়েছে দেখা যাক্। বিলটির দ্বিতীয় চ্যাপটারের ৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ভারতের জনবিন্যাসে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বিভিন্ন 'গ্রুপ' বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়েছে। গ্রুপের এই বিভাজন করা হয়েছে ধর্ম ও ভাষাগত পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। যেমন, মুসলিম, খৃস্টানদের সঙ্গে তপশিলী জাতিকেও গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দলিতদের উপর অত্যাচার হলে তাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা হবে। সংখ্যাগুরু হিন্দুদেরই একমাত্র শাস্তি পেতে হবে। প্রশ্ন উঠেছে, যদি কোনও মুসলমান যুবক দলিত যুবতীর শ্লীলতাহানি করে সেক্ষেত্রে কী হবে? বিলের প্রস্তাবনাতেই বলা হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দাঙ্গার প্ররোচনামূলক অপরাধ করতেই পারে না। তাই এমন অপরাধকে সাধারণ ফৌজদারি আইনের আওতায় আনা হবে। কিন্তু হিন্দু যুবক এমন অপরাধ করলে তা কেন্দ্রীয় দাঙ্গা দমন আইনেই বিচার হবে।

বিলটির খসড়ার ৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ''হেট ক্যাম্পেন'' বন্ধ করতে কেন্দ্রীয় আইনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই 'হেট ক্যাম্পেন' কী বা কাকে বলা হবে তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, দেশের সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি এমন কোনও মন্তব্য করেন যাতে তাঁদের মনে আঘাত লাগে তবে সেই মন্তব্যকে 'হেট ক্যাম্পেন' বলা হবে। সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাবার উদ্দেশ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় এমন প্ররোচনা দিয়েছে। বিলের খসড়ায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, হিন্দুরাই দাঙ্গার প্ররোচনা দেয়। দাঙ্গা শুরু করে। তারাই একমাত্র অপরাধী। দাঙ্গায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় জড়িয়ে পড়লে তা নিছকই আত্মরক্ষার কারণে বলে বিলের খসড়ায় বলা হয়েছে।

আগামী বছর সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে দাঙ্গা দমনের জন্য এই কেন্দ্রীয় বিলটি পেশ করার সিদ্ধান্ত মনমোহন সরকার নিয়েছে। বিজেপি বাদে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলই জানিয়ে দিয়েছে যে সংবিধানের ৩৬৫ ধারার বিরোধী অংশটুকু ছেঁটে ফেললেই তারা প্রস্তাবিত বিলটির সমর্থন করবে। সোজা-সাপ্টা বলতে গেলে বলতে হয় মমতা—বুদ্ধ—লালু— মায়াবতী সকলেই মনে করেন ভারতে হিন্দু হয়ে জন্মানোটাই অপরাধ।

এই সময়

সম্মান হত্যার বিচার এতদিনে!

ঘটনাটি ঘটে ২০০৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর-পশ্চিম ইংল্যান্ডের চেশায়ারে। শাফিলিয়া নামে ১৭ বছরের একটি বালিকাকে পারিবারিক সম্মান রক্ষার অজুহাতে মুসলমান সমাজে 'অনার কিলিং' নামে যে অমানবিক কু-প্রথাটি প্রচলিত আছে তার শিকার হতে হয়। এর পরের বছরের গোড়ায় কাম্ব্রিয়া নদীর তীর থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার প্রায় আট বছর পর পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত শাফিলিয়ার 'সম্মান হত্যা'র জন্য তার পাক বংশোদ্ভুত বাবা-মা'র বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করল লন্ডন পুলিশ।

মাথাব্যথার নাম নেপাল

নেপালের নতুন উপমুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয় কুমার গাচ্ছাদার ভারত-সীমান্তে তরাই অঞ্চলে বিদ্রোহী ও উগ্রপন্থীদের সঙ্গে নেপাল সরকারের অবিলম্বে আলোচনায় বসার কথা জানিয়েছেন। নেপাল সরকার ইতিমধ্যেই তরাই অঞ্চলে তাণ্ডব করা, সম্পত্তি লুঠ করা, সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস করা প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজকর্মের জন্য ১২টি সশস্ত্র গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করেছে। সরকারের সঙ্গে আলোচনায় না বসলে নেপাল সরকার যে এই দুষ্কৃতকারী গোষ্ঠীগুলোকে কোনওরকম রেয়াত করবে না বলে শ্রী গাচ্ছাদার জানালেও, তার ওপর কোনও আস্থা রাখছেন না ভারতের কূটনৈতিক মহল। তাঁরা মনে করছেন, তরাই-এর উপদ্রবের দাবি সহজে ছেড়ে দেবে না ওই সশস্ত্রগোষ্ঠীগুলি। সেক্ষেত্রে এদেশের কূটনীতিবিদ্‌দের আশঙ্কা, সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে নিরুপদ্রবে ভারত-সীমান্ত পার করিয়ে এপারে উপদ্রব চালানোর অবাধ লাইসেন্স মঞ্জুর করতে পারে নেপালের মাওবাদীরা।

পাক-চীন বিবাদ

উইগুর মুসলিমদের কেন্দ্র করে পাক-চীন বিবাদের একটা পটভূমি তৈরি হচ্ছে বলে কূটনীতিক ও সমর-বিশেষজ্ঞদের অনুমান। সম্প্রতি একটি জেহাদী গোষ্ঠী প্রকাশিত ভিডিও-তে দেখা গেছে, চীনের জিন-জিয়াং প্রদেশে সাম্প্রতিক চীন-বিরোধী রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া দাঙ্গার দাঙ্গাকারীদের প্রশিক্ষণ হয়েছিল পাক-ভূমিতে। জিনজিয়াং প্রদেশে এরকম দাঙ্গা নতুন কিছু নয়। তবে ইদানীংকালে তা মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে বেড়ে গেছে। গত মাসে পাক-সীমান্ত লাগোয়া জিনজিয়াং প্রদেশের দু'টি শহরে হামলা চালিয়ে উইগুরেরা চল্লিশ জনকে হত্যা করে। গত দু'বছর স্রেফ ভারত-বিরোধিতার কারণে চীন উইগুরদের ব্যাপারে পাকিস্তানকে নিদেনপক্ষে কড়া কথাও শোনাতে পারেনি। এবার 'ভিডিও' ফাঁসের পর চীন কি পদক্ষেপ নেয় সেটাই এখন দেখার।

ওমাকৃতি ট্যাটু

কিশোরী মিলে সাইরাস ইতিমধ্যেই মার্কিনী সিনে দুনিয়ায় নিজের নাম পাকা করে নিয়েছেন। তবে আরেকটা কারণেও তিনি বিখ্যাত। সেটা হলো নিজের হাতে সর্বত্র বিভিন্ন ট্যাটু (কালি দিয়ে চিত্রাঙ্কন) ফুটিয়ে তোলা। সাইরাস দাবি করেন, তিনি অর্থহীন ট্যাটু ব্যবহার করেন না। আপাতত তাঁর হাতে হিন্দুত্বের ওম (ওঁ) আকৃতির ট্যাটু শোভা পাচ্ছে। তবে এটা যে শখের নয়, বরং সাইরাসের দাবির যৌক্তিকতাকেই প্রমাণ করে তার নমুনা হলো তিনি হিন্দুত্বের প্রতি অটল বিশ্বাসে 'জন্মান্তরবাদে' বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন এখন।

বধির সিবিআই

জনতা দলের সভাপতি সুব্রমানিয়ান স্বামীর আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট গত ৮ সেপ্টেম্বর টু-জি স্পেকট্রাম কাণ্ডে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম, অ্যাটর্নী জেনারেল জি ই বাহানবতী এবং এডিএজি চেয়ারম্যান অনিল আম্বানী'র ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করলে নিশ্চুপ থাকে সিবিআই। সুপ্রিম কোর্টে করা আবেদনে সুব্রমানিয়ান স্বামী বলেছিলেন, তৎকালীন টেলিকমমন্ত্রী এ রাজার সঙ্গে স্পেকট্রামের মূল্য চূড়ান্ত করতে কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম তার নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে তিনি টু-জি স্পেকট্রাম কোম্পানীগুলিকে এটিসালাট ও টেলেনরের মতো দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত স্পেকট্রামগুলো অবাধে বেচার ছাড়পত্র কেন দেওয়া হলো সে নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। এ বাপারেও কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি সিবিআই। সুব্রমানিয়ান স্বামী'র আইনজীবীর সওয়ালের কাছে ওইদিন আগাগোড়াই নীরব ছিল তারা।

মঙ্গলনিধি

মেদিনীপুর জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মাদপুর খণ্ডের ব্যবস্থা প্রমুখ সঞ্জয় কর ও তনুশ্রী করের পরিণয় উপলক্ষে সেবাকাজের জন্য ১০০১ টাকা মঙ্গলনিধি প্রদান করা হয় মেদিনীপুর বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখ নিত্যানন্দ দত্তের হাতে। অনুষ্ঠানে ধনঞ্জয় ঘোষ, সমিত দাস, গৌরহরি দত্ত উপস্থিত থেকে নবদম্পতির মঙ্গল কামনা করেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তাম্রলিপ্ত জেলার অন্তর্গত রাধাবল্লভচকের অধিবাসী বাদল মণ্ডল তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের শুভবিবাহ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে ছয়শত টাকা 'মঙ্গলনিধি' অর্পণ করেন সঙ্ঘের জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ নিরঞ্জন প্রামাণিক-এর হাতে। সমাজ সেবাভারতী, পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে এই অর্থ ব্যয় করা হবে।

* * *

গত ২৬ জুলাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহব্যবস্থা প্রমুখ কল্যাণ সাহা তার একমাত্র কন্যা ঋত্বিকা সাহার সহিত শুভেন্দু মজুমদারের শুভ বিবাহ উপলক্ষে আয়োজিত প্রীতিভোজে মঙ্গলনিধি হিসাবে দশ হাজার এক টাকা নদীয়া বিভাগ সঙ্ঘচালক দুর্গাদাস রায় চৌধুরীর হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল উপস্থিত ছিলেন।

শক্তিশালী হিন্দু-দরদী প্রচারমাধ্যম দরকার

ডঃ স্বরূপ ঘোষ

পশ্চিমপন্থী ও নিরীশ্বরবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত পেট্রো-ডলার ও ইউরো- ডলারের কাছে নিবেদিত প্রচার মাধ্যম দ্বারা হিন্দু সমাজ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রবাদী প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করে রাষ্ট্রযন্ত্রের শক্তি প্রয়োগ করে হিন্দু দরদী প্রচার মাধ্যমকে গড়ে উঠতে সবরকম অসহযোগিতা করা হয়েছে স্বাধীনতা উত্তরকালে। যে সকল রাজ্যে তাঁরা কালের নিয়মে শক্তি অর্জন করে হয় শাসন ক্ষমতায় নয়তো প্রধান বিরোধী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সেখানেও তাঁর প্রচার মাধ্যম মধ্যপন্থী ও পশ্চিম ঘেঁষা রাজনৈতিক দলগুলির আশ্রয়ধন্য প্রচারমাধ্যমের চেয়ে এখনও বেশ দুর্বল। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাও প্রায় নেই বললেই চলে।

এবার ফিরে আসি পশ্চিমবঙ্গে। এখানের প্রচার মাধ্যমগুলি কেউ-ই নিরপেক্ষ নয়। তাঁরা হয় শাসক নয় প্রধান বিরোধী শক্তির পক্ষে পাল তুলে রেখেছে। মুখে নিরপেক্ষ বলে চলেছে। সেটা প্রচারের জন্য বলতে হয়। মুখোশ দিয়ে মুখটাকে আড়াল না করে রাখলে হিন্দু চিনে ফেলবে তো। তবে একটি বিষয়ে একমত সকলে তীব্র হিন্দু বিদ্বেষ প্রচারে। এ বিষয়ে অভেদ দর্শন। হিন্দুকে রাজদণ্ড থেকে দূরে রাখতে সকলে একমত। তাই হিন্দু বাঙ্গালী বাংলাদেশে চরম লাঞ্ছিত হলেও খবর প্রকাশিত হয় না। ছাপা হলেও পঞ্চম পাতায় পাঁচ কলমে যাতে চোখে না পড়ে এমন জায়গায়। তাতে খবর দেওয়াও হলো আবার গুরুত্ব না দেওয়াও হলো। কি অসম্ভব নিরপেক্ষতা! প্রতি তিনজন পশ্চিমবঙ্গবাসী মুসলমানের একজন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী মুসলমান জেনেও চুপ থাকা। পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসের চরিত্র বদলে যাচ্ছে বুঝেও নির্বাক, নির্লিপ্ত থাকা। কারণ বণিকে বোঝে ব্যবসা। সাংবাদিক আজ আর সমাজসেবী নয়, এখন সে "লবিস্ট" হতে শিখেছে। সবাই না হলেও অনেকেই।

নিরপেক্ষতার আড়ালে পক্ষপাতিত্বের প্রতিযোগিতা চলছে পুরোমাত্রায়। নিরীশ্বরবাদীরা প্রথম হিন্দুর ইতিহাসটাই ভুলিয়ে দেবার ব্রত নিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সফল হলে সুপ্রাচীন ইতিহাস গুলিয়ে দেওয়াও সহজ হবে। হিন্দু বিদ্বেষী শক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দুর বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের ব্যাখ্যায় নেমেছে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থে। তাই হিন্দু ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থগুলির সঠিক ব্যাখ্যার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, শ্রী অরবিন্দ আশ্রম তথা ভূ-ভারতে অন্যান্য প্রসিদ্ধ মঠ-মিশনের থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের উপরই শুধু ভরসা রাখুন। সাত্ত্বিক হিন্দুরা নিরীশ্বরবাদী ও হিন্দু নামের আড়ালে মুসলমানী ব্যাখ্যা থেকে সতর্ক থাকুন। হিন্দু-বিদ্বেষ বহুল প্রচারিত মাধ্যমগুলিতে এতই গভীরে প্রেথিত যে রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি যখন ঘটে তখন হিন্দুকে সর্বতোভাবে দোষী সাব্যস্ত করে বছরের পর বছর প্রচার চালিয়ে জনমত গঠন করে নেওয়া হয়। যাতে হিন্দুই হিন্দুর বিরুদ্ধে কথা বলে, তারপর সেই প্রচারের সত্যাসত্য যখন বিচারালয়ের রায়ে প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে দাঁড়ায় দিনকয়েক সেই বিধানের উপর আলোচনা করেই চুপচাপ হয়ে যায় প্রচার মাধ্যম। অযোধ্যা, গোধরা, ওড়িশায় পাদ্রী নিগ্রহের ঘটনাগুলি একের পর এক প্রমাণ করে দিয়েছে যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বহুল প্রচারিত প্রচার মাধ্যমের দৃষ্টিভঙ্গি ও আদালতের রায়ের চিত্রপট, চিন্তন, মনন ও উপসংহার এক নয়।

ধর্মান্তর নিয়েও সেই একই মানসিকতা। হিন্দু থেকে ছলে-বলে-কৌশলে যখন মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মে ধর্মান্তর হয় তাকে যুক্তি তর্ক দিয়ে সমর্থন করে লেখার তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী কলমচির অভাব থাকে না। কারণ সে লেখা "paid article" আবার কখনও "contract writing"। সেখানে বলে দেওয়া হয় কিভাবে লেখাটা উপস্থাপনা করা হবে তাহলেই নগদ নারায়ণ লাভ হবে। তাই ব্রহ্মকে বিসর্জন দিয়ে বিত্ত সাধনারত বিবেক বর্জিত তথাকথিত সরকারি প্রসাদ প্রাপ্ত স্বনামধন্য লেখককুল কাগজে মুসলমান দরদী হিন্দু স্বার্থ বিরোধী লেখা লিখে তৃপ্তি পান।

ধর্মান্তর প্রক্রিয়াকে সহজে হিন্দু ধর্মের জাত-পাতের জন্য বলে সরল ব্যাখ্যায় চলে গেলে সত্যের অপলাপ করা হয়। সবাই জানে সত্য কোথায়, কীভাবে রাষ্ট্র যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে এ কার্য করা হয়েছে তার ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। তার জাতপাতের জন্য এ ধর্মান্তর তর্কের খাতিরে ধরে নিলেও বলতে হয় বৌদ্ধ ধর্মে তো জাতপাত নেই। তাহলে হিন্দু থেকে বৌদ্ধ হয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের ক্ষেত্রে তো জাতপাতের তর্ক খাটে না। অবশ্য দুর্জনের ছলের অভাব নেই। কুতর্কে গুলিয়ে দেবার জন্য বরাত পাওয়া আছে আগে থেকেই। তাই সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য করার জন্য বহুল্য প্রচারিত সংবাদ মাধ্যম স্বাধীনতার পর থেকেই কাজ করে চলেছে। বিশ্বাস রেখেছে তাঁরা বিত্ত বৃদ্ধিতে, ভক্তি রয়েছে কামিনীর সঙ্গে রজনী যাপনে আর হিন্দুকে জ্ঞান দিয়ে সহজে অর্থ উপার্জনে। কারণ— যবনে অমন জ্ঞান দিলে মান বাঁচিয়ে চলা দায় হবে, তাই নরম-সরম হিন্দু জাতিকে জ্ঞানদান, মুসলমানকে তোষামোদ ও প্রশাসনকে খোশামুদে রেখে নিজে ভোগের সাধনায় রত থাকা। এই হলো তাঁদের সার কথা। হিন্দুর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবে কে কবে বড়লোক হয়েছে যে বর্তমান স্বনামধন্যরা যে বোকামি করবে অত ন্যাকা তাঁরা নন।

যে মহম্মদ গজনী চূড়ান্ত বর্বরতা করেছে ভারতের হিন্দু জনসমাজের উপর। সোমনাথ, মথুরায় সে সবের অনেক উদাহরণ রয়েছে, তাকে নিয়ে নিরীশ্বরবাদী বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমের কি আদিখ্যেতা। তার নামে ভারতে সিনেমা হয় আবার Ghazni Hair Style। অচেতন হিন্দু উদ্বাস্তু ছেলে সেলুনে গিয়ে না বুঝে প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে তেমন করে নিজেকে সাজিয়ে এসে খুশী থাকে। স্বর্গে

> **"মধ্যযুগে বর্বরতার মাধ্যমে যে ধর্মান্তর হয়েছে এখন মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে যে কাজে নেমেছে মধ্যপন্থী শক্তি। নতুন বেশে, নতুন যুগে। তখন হিন্দু রাজায় রাজায় বিবাদের সুযোগ নিয়ে ঢুকেছিল বিদেশী মুসলমান হানাদার। এখন তাঁরাই বিশ্বাসঘাতক বিত্তশালী হিন্দুকে সঙ্গে নিয়ে সরলমতির হিন্দু জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার কাজে নেমেছে।"**

উত্তর-সম্পাদকীয়

পিতৃপূর্বপুরুষ দুঃখ পান। পেট্রো-ডলারে পুষ্ট বিক্রি হওয়া হিন্দু লেখককুল দায়িত্ব নিয়েছে হিন্দুকে ঘুম পাড়ানোর। হিন্দু থেকে ধর্মান্তরে যাদের অভক্তি নেই, হিন্দু যদি কোনওভাবে পুনঃধর্মান্তরের প্রক্রিয়াটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাহলেই তীব্র সমালোচনার সুর শোনা যায় বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমের পাতায়। এই মানসিকতার সঙ্গে মুসলমান নবাবদের মনের কথার কোনও পার্থক্য দেখেন কি? দেখবেন নেই। হৃদয় পড়ে আছে ভোগবাদে— হিন্দুর দুঃখ কষ্ট নিয়ে ভেবে লাভ নেই প্রধান সংবাদ মাধ্যমগুলির। ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও মালেশিয়ায় হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্ম একসময় প্রধান ছিল। এ সকল স্থানে কিন্তু মুসলমান ধর্ম কীভাবে প্রধান হয়ে উঠল সে কথা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে। হিন্দু থেকে বৌদ্ধ হওয়া মানুষজন মুসলমান হলেন কেন? বিশ্বে আজ সমগ্র মুসলমান জনসংখ্যার বিপুল অংশই হিন্দু ধর্মান্তরিত। যাঁরা হিন্দু থেকে বৌদ্ধ, তারপর মুসলমান হয়েছেন তাঁরাই মুসলমান সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ।

প্রচার-মাধ্যম হিন্দুকে ভ্রান্তিবিলাসে রেখে নিজে রাজবিলাসে থাকার ছল-কল পাকাপাকিভাবে তৈরী করেছে। যাঁরা চূড়ান্ত নিরীশ্বরবাদী, চরম হিন্দু বিদ্বেষী তাঁরা ভোট প্রচারের সময় আবার প্রসাদী ফুল বেলপাতা পকেটে রাখেন, মন্দিরে প্রণাম সারেন, লোক দেখানো সাধুসঙ্গ করেন যাতে বিশ্বাসী হিন্দুর ভোটটা পাওয়া যায়। তাঁরাই মুসলমান-প্রধান জায়গাগুলি ভারতে রাখতে পারলেন না কেন? মুসলমান দরদী নিরীশ্বরবাদী ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা বলুন না, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে স্বাধীনতার আগে কংগ্রেস সরকার ছিল, সেখানেও ভারতের পক্ষে ভোট পড়লো না কেন? আজও ভারত- পাকিস্তান খেলায় মুসলমান প্রধান এলাকায় মনে টান কোনদিকে জানে না মধ্যপন্থীরা?

তথাকথিত নিরপেক্ষ পত্র-পত্রিকার শুভানুধ্যায়ীরা জানেন বর্তমান ভারতের প্রদেশগুলির মুসলমান জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষরা দেশভাগের আগে কোন পক্ষে কীভাবে আকুল হয়ে ভোট দিয়েছিল। এখন মধ্যপন্থীরা ভোটের লোভে তাঁদের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ইতিহাস বই খুললেই সে সত্য আলোর মতো পরিষ্কার। তাও জেনে অসীম আনন্দে মুসলমানের সামান্যতম ভারতপ্রেম দেখলেই আপ্লুত হতে হবে, না হলে চলবে না। চূড়ান্ত ভারত বিরোধিতার শত উদাহরণ থাকলেও কাব্যে, থিয়েটারে, সিনেমায় সবচেয়ে ভারতপ্রেমিক ভূমিকাটা মুসলমানের জন্য তোলা থাকবে না হলে ধর্মনিরপেক্ষতার রোমান্টিক উপন্যাসটা লেখা যাবে না। এই মধ্যপন্থার প্রবক্তা নেহেরুজী তাঁর বিখ্যাত বই "The Discovery of India"-তে "What is Hinduism" প্রবন্ধটিতে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে যা লিখেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দের হিন্দুধর্মের সম্পর্কে ব্যাখ্যার সঙ্গে তাঁর অশেষ অমিল। যে "ধর্মনিরপেক্ষতার" কথা জোরালোভাবে বলছে নিরীশ্বরবাদী শক্তি সেই শব্দটিই সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ঢোকানো হয়েছে। মূল সংবিধানে যা ছিল "Sovereign Democratic Republic of India" এখানে Secular আর Socialist কথা দুটো সংবিধান সংশোধন করে ঢোকানো হয়েছে। তাই এখন লেখা হয় "Sovereign Socialist Secular Democratic Republic of India." নেহরুজী হিন্দু ধর্মকে ধর্ম হিসাবেই মানতে চাননি যাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন সকল ধর্মের জননী স্বরূপ। একবার সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে একটি বিষয় নিয়ে দলাদলি মুক্ত জনমতের প্রকাশ পাবে এমনভাবে গণভোট নেওয়া হোক না যে দেশের বেশিরভাগ মানুষ কি চায় ধর্মনিরপেক্ষ ভারত না হিন্দুরাষ্ট্র। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভারতবাসী কি চায় মধ্যপন্থীদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। উত্তরটা ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থকরাও জানেন কিন্তু পেট্রোডলার ইউরো- ডলারের মোহে বলতে ভয় পান।

মধ্যযুগে বর্বরতার মাধ্যমে যে ধর্মান্তর হয়েছে এখন মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে যে কাজে নেমেছে মধ্যপন্থী শক্তি। নতুন বেশে, নতুন যুগে। তখন হিন্দু রাজায় রাজায় বিবাদের সুযোগ নিয়ে ঢুকেছিল বিদেশী মুসলমান হানাদার। এখন তাঁরাই বিশ্বাসঘাতক বিত্তশালী হিন্দুকে সঙ্গে নিয়ে সরলমতির হিন্দু জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার কাজে নেমেছে। যে ভীষণ, বীভৎস পাপ মধ্যযুগে মুসলমান নবাবরা করেছে তা ঢাকতে কাজে নেমেছে বিক্রি হওয়া হিন্দু নামধারী মুসলমানসেবী বুদ্ধিজীবীরা। তাই ভারতবর্ষকে চিনুন স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদ পড়ে।

হিন্দু মঠ মিশনের ট্রাস্টীদের অনুরোধ, মন্দিরের অর্থ হিন্দু দরদী প্রচার মাধ্যম গঠনের কাজে এগিয়ে আসুন। বিপদ শিয়রে। তাঁদের তত্ত্বাবধানে হিন্দুদরদী পত্র পত্রিকা দরকার। সত্য উন্মোচনে। হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করতে। উদ্দীপ্ত করতে শিবমন্ত্রে। দেশ রক্ষার্থে। মাতৃমন্দিরের সুরক্ষা নিশ্চিন্ত করতে। পশ্চিমবঙ্গের এর প্রয়োজন আজ সর্বাধিক কারণ পশ্চিম থেকে ঢুকেছিল মুসলমান পূর্ব থেকে ইংরাজ। এবার পূর্বেই তৃতীয় মুসলমান গরিষ্ঠ রাষ্ট্রের জাগরণ হচ্ছে। অসম ও পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা স্পর্ধার সীমা অতিক্রম করছে। লাগামহীন মুসলমান অনুপ্রবেশে বৃহত্তর বাংলাদেশের কুশীলবরা সুখস্বপ্ন দেখছে। দেশের বহুল প্রচারিত প্রচার মাধ্যম আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছে। স্বস্তিকাকে তাই ভোরের আলো গায়ে মেখে বেরতে হবে। ২০১৩ থেকে সাত দিনে একদিন নয়— রোজ। সকালবেলা দেবী প্রণামের পরই যাতে হিন্দু বাঙ্গালী হাতে পায় নতুনরূপে চির পুরাতনকে। স্বামীজী বলেছিলেন, "আমাদের কাজের মূল কথাটা সবসময় মনে রেখো— ধর্মে একটুও আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নতি। মনে রাখবে— দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবন।... জাতির ভাগ্য নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাদের তুলতে পার? তাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করে কি তাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দিতে পার? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য ও ধর্মবিশ্বাসে ও সাধনে ঘোর হিন্দু হতে পার? এইটিই করতে হবে, এবং আমরাই তা করব। আমি দৃঢ়ভাবে বলছি, হিন্দু সমাজের উন্নতির জন্য ধর্মকে নষ্ট করবার কোনও দরকার নেই। ধর্মের জন্যই যে সমাজের এই অবস্থা তা নয়, বরং ধর্মকে সামাজিক ব্যাপারে যেভাবে কাজে লাগানো উচিত, তা হয়নি বলেই সমাজের এই অবস্থা।... ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি রয়েছে ধর্মে। যতদিন পর্যন্ত হিন্দুজাতি তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মহান উত্তরাধিকার বিস্মৃত না হয়, ততদিন জগতের কোনও শক্তি তাঁদের ধ্বংস করতে পারবে না।... হিন্দু যেন কখনও ধর্ম ত্যাগ না করে। তবে ধর্মকে তার নির্দিষ্ট সীমার ভিতর রাখতে হবে, আর সমাজকে উন্নতির স্বাধীনতা দিতে হবে।... ভারতে সমাজসংস্কার প্রচার করতে হলে দেখতে হবে, সেই নতুন সামাজিক প্রথার সাহায্যে আধ্যাত্মিক জীবনলাভ করবার কি বিশেষ সাহায্য হবে। রাজনীতির প্রচার করতে হলেও দেখতে হবে, আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা— আধ্যাত্মিক উন্নতি তার দ্বারা কত বেশী পরিমাণে সাধিত হবে।" (আমার ভারত, পৃষ্ঠা ২১-২৩) কিছুদিন সময় লাগবে। অন্যান্য রাজ্যের সমদরদী মানুষকেও পূর্বের বিপদ যে ভারতবর্ষের বিভীষিকা একথা বোঝাতে হবে। বাংলায় এলেও বৃটিশ শাসন কিন্তু বাংলাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ভারতে। তেমনিই মুসলমানের তাপ-উত্তাপ শুধুই পূর্বকেই চিতায় তুলবে তা নয় সমগ্র ভারতই তার অগ্নিশিখার শিকার হবে, হচ্ছেও। তাই সর্বভারতীয় সমমনোভাবাপন্ন হিন্দু জনতার কাজ থেকে সংগ্রহ করতে হবে প্রণামী। তাতে আসুক না মা সহজ বেশে। গেরুয়া পাড়ের সাদা শাড়ী গায়ে। সে বেশেই হবে পুষ্পাঞ্জলি। বারবনিতার রেশমী কাপড় নাই বা থাকল তাঁর গায়ে। পাঠক তাঁর শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাকে গ্রহণ করবে। অচিরেই দেবীকে সেই-ই সাজিয়ে দেবে স্বর্ণ অলঙ্কারে। পূজা শুরুর পূর্বে পূজারী দেখবেন নবরূপে স্বস্তিকা। মা দুর্গার বেশে দাঁড়িয়ে আছে সসম্মানে। তাঁদের সম্মিলিত প্রার্থনার আশায় রইলাম। ১২-ই জানুয়ারি ২০১২ স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত বছরের সূচনা কালে যদি দেখি উষালগ্নে শিবমন্ত্র বুকে নিয়ে স্বস্তিকার জাগরণ? বুঝব হিন্দু জাতি সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

অতিথি কলম

মুজফফর হোসেন

বারুদের স্তূপের ওপর করাচী

১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর ছয়দশকের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ে অজস্র হিন্দুমন্দির ধ্বংস করা হয়েছে। তবুও করাচীতে এখনও অনেক হিন্দুমন্দির অবশিষ্ট রয়ে গেছে। অনেক মন্দির বন্ধ। অনেক মন্দির বাণিজ্যিক বিপণির আকার নিয়েছে।

করাচীর প্রাচীন নাম ছিল ‘দেবল নগর’। পাকিস্তানে করাচীর মান্যতা বা অবস্থান ভারতের ক্ষেত্রে মুম্বাই-এর মতোই। এই দুটো শহরেই আজও গুজরাটী সভ্যতার নিদর্শন বর্তমান। মুম্বাই শহরে কারও মুখে ‘কচ্ছী’ ভাষা (কচ্ছ-এ বসবাসকারীদের কথ্য ভাষা) শুনলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু

২০০৯ সালের ডিসেম্বরের শেষে করাচিতে বোমা বিস্ফোরণ (ফাইলচিত্র)।

করাচীতে এখনও ‘কচ্ছী’ ভাষায় অনেকেই কথা বলে থাকেন। দীপাবলীর সময়ে চৌপড় পূজনের অনুষ্ঠান হয়, পারস্পরিক ধুতি পরিহিতদেরও দেখা মেলে। ওখানে কতজন ভালোমতো ধুতি পরতে জানে তা হয়তো খোঁজ-খবর করলে জানা যেতে পারে, তবে ভারত থেকে সেলাইকরা ধুতি করাচীতে আমদানি করানো হয়। কচ্ছের (ভারতের গুজরাট) লোকেরা সমুদ্রপারে করাচীর ঝলমলে আলোর রশ্মি দেখতে পায়, করাচীর লোকেরা বলে ওই আমাদের কচ্ছ। কিন্তু এখন তো ভৌগোলিক দূরত্বের থেকেও দু’দেশের মানুষের মনের, অন্তরের, পারস্পরিক দূরত্ব বেড়ে গিয়েছে।

একটা প্রশ্ন এতাবৎ নিরুত্তরিত থেকে গেছে— যখন পাঞ্জাব ও বাংলার সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভাজন হলো, তাহলে সিন্ধুপ্রদেশের ক্ষেত্রে হলো না কেন?

দেশভাগের প্রাক্কালে সিন্ধুর মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী আন্দোলনে নেমেছিলেন যে, সিন্ধুপ্রদেশও ধর্মমতের ভিত্তিতে বিভক্ত হওয়া উচিত। তখন যোধপুরের তৎকালীন মহারাজা বলেছিলেন, সিন্ধুপ্রদেশের দু’টি জেলা— করাচী ও থরপারকার হিন্দুবহুল বা হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। যোধপুরের তিনটি জেলা তিনি (হিন্দু) সিন্ধুপ্রদেশকে দিতেও চেয়েছিলেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল হিন্দু সিন্ধুদেশ হওয়াই চাই। মুসলমান মুখ্যমন্ত্রীর দাবী শুনে জহরলাল নেহরুর লাল চেহারা হলুদ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, এসব প্রলাপমাত্র। পরে গান্ধীজীর আগ্রহে নেহরুজী মৌলানা আজাদের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। মৌলানা এক পাতার একটি রিপোর্ট দাখিল করেই দায়িত্ব সারেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন— ‘‘সিন্ধুকে ভাগ করে হিন্দু জনসংখ্যার ভিত্তিতে সিন্ধুদেশ গঠনের কোনও দাবীই নেই।’’ এই রিপোর্টের পরই মহম্মদ আলি জিন্না ওই উদার মুখ্যমন্ত্রীর ‘স্বর’ চিরতরে চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এরপর করাচী পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পাকিস্তানের প্রথম রাজধানী হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়।

দাঙ্গা, অপহরণ

দেশ বিভাজনের পরে পশ্চিম ভারতের মুসলমানরা অনেক আশা নিয়ে স্বপ্নের পাকিস্তানের করাচীতে পৌঁছায়। তাদের কপালে জোটে ‘মোহাজির’ তকমা। করাচী এবং আশপাশের মূল নিবাসীরা আশঙ্কা করে যে, তাদের আর্থিক ব্যবস্থা নবাগতদের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর ফলে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। ওদের জনসংখ্যা বাড়তে না বাড়তেই রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে থাকে। নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের জন্য ভারত থেকে আগতরা নিজেদের রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করে। আলতাফ হুসেনের নেতৃত্বে ‘মোহাজির কৌমি মুভমেন্ট’ দানা বাঁধে। মোহাজিরদের মধ্যে সুরক্ষার নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে কৌমি মুভমেন্ট। পরে আফগানিস্তান থেকে শরণার্থীর দল করাচীতে পৌঁছালে পাঠান ও সিন্ধীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। করাচীকে কব্জা করার জন্য মোহাজির, পাঠান ও সিন্ধীদের পারস্পরিক সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। এখন তো প্রায়দিনই দাঙ্গা লেগে থাকে। অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়— এক সহজ রোজগারের পথ তৈরি হয়েছে। আফিম, চরসের চোরাচালান থেকে মানুষ পাচার— সবই খোলামেলা, কোনওকিছুই আর লুকোছাপা নেই। এজন্য অনেকে আবার তাচ্ছিল্যভরে করাচীকে ‘কসাইখানা’ বলে থাকে। ছোট ছোট শিশু-বালকরা কীভাবে অনাথ হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন! এ ব্যাপারে ‘দৈনিক নবাএ বক্ত’— পত্রিকার গত ২০ জুলাই সংখ্যায় একটি বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যার শিরোনামই হলো— ‘‘করাচী দুনিয়া কা সবসে বড়া অনাথালয়।’’ ওই দিনই ‘দৈনিক ডন’ পত্রিকার একটি সংবাদের শিরোনাম ছিল— ‘‘করাচী জ্বলছে, ২৪ ঘণ্টায় ৩৪ জন নিহত। ৮ জানুয়ারী থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত ৮০০ জনকে হত্যা করা হয়েছে। ডেইলি টাইমস-এ সাংবাদিক আনোয়ার সঈদের প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল— ‘করাচীতে উৎপাৎ’। ওই প্রবন্ধে লেখক করাচীর বর্তমান অবস্থার এক সমীক্ষা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন— ‘‘ভারত-পাকিস্তান দেশভাগের সময় পাক-প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি এবং জহরলাল নেহরু সহমত ছিলেন যে, যে সকল ভারতীয় মুসলমান পাকিস্তানে যেতে চান তারা বাঘা-আটারী সীমান্তের পথে যেতে পারেন। কিন্তু সংখ্যা বেশি থাকার কারণে করাচীর দুই সরকারি অফিসার এ টি নকভী এবং হাসিম রাজা পাক-প্রধানমন্ত্রীকে সিন্ধুতে আরও একটি প্রবেশপথ খোলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তখন হাজার হাজার উর্দুভাষী মুসলমান পাকিস্তান আসে। তাদের বেশিরভাগই করাচীতে আস্তানা গাড়ে। সেই সময়ে করাচীতে ভারতীয়

মুসলমানদের সংখ্যাই (ভারত থেকে পাকিস্তানে যাওয়া) সবচেয়ে বেশি ছিল।" ওই সংবাদ অনুসারে বর্তমানে করাচীর জনসংখ্যা প্রায় দু'কোটি। প্রতিদিন ব্যবসায়িক লেনদেনের হিসাবও প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার মতো (দশ খরব)। কিন্তু বিগত কুড়ি বছরে একটা দিনও শান্তিতে কেটেছে কিনা তা বলা যাবে না। প্রতিদিনই হিংসাত্মক ঘটনার আগুন জ্বলছে। হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। মনে হয় এইসব হত্যাকাণ্ডের পিছনে জাত-পাতগত এবং ভাষাগত কারণ রয়েছে। করাচী শহরের বাইরের দিকে সিন্ধি, পাঞ্জাবী, পুস্ত এবং বালুচ্ ভাষাভাষী লোকেরাও থাকেন। উপর উপর সবাই যতই একতা দেখাক আসলে ভিতরে ভিতরে কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ভীষণ মনোমালিন্য ও অবিশ্বাস বর্তমান। এক একটি জাতি ও ভাষাগোষ্ঠীর নিজ নিজ মাফিয়া গোষ্ঠীও তৈরি হয়েছে। তারা রোজগার ও ব্যবসাবাণিজ্যে আপন আপন আধিপত্য বজায় রাখতে চায়। এজন্য যে কোনওরকম হিংসাত্মক ঘটনা ঘটাতে পিছপা নয়।

> **করাচী গত ৩০ বছর যাবৎ পাকিস্তানী সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। হতে পারে করাচীবাসীরা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলো করাচীকে পৃথক করতে না বাধ্য হয়! করাচী পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হলে করাচীবাসীরা অন্য দেশের সাহায্যে সুখ-শান্তি বয়ে নিয়ে আসতে পারে। করাচী যদি পাকিস্তানের হাতছাড়া হয় তাহলে দেশের অর্থব্যবস্থা চৌপট হয়ে যাবে।**

কফিনের দোকানে ভীড়

১৫ জুলাই-এর দৈনিক 'নবাএ বক্ত' সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় একটি বড় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। লেখক মহম্মদ আমেদ তরাজি। শিরোনাম— ''কফিনের দোকানে ভীষণ ভীড়"। লেখকের বক্তব্য করাচীতে যে কোনও ব্যক্তিই রাস্তায় চলাকালীন গুলিবিদ্ধ হতে পারে। বলিকা হাসপাতালের একটি দৃশ্য মর্মবিদারক। মিঞা গুল একমাত্র কন্যাসন্তান লাইবা'র লাস কোলে নিয়ে কেঁদে চলেছে। রক্তরঞ্জিত ওই মৃতদেহে কেউ হাত লাগাতে গেলেই গুল ঝটকা দিয়ে সেই হাত দূরে ঠেলে দিচ্ছে। বিয়ের সাতবছর বাদে অনেক দোয়া-খিদমত করে ওই মেয়ের জন্ম হয়েছিল। মিঞা গুল কসবা কলোনীর টিলার উপরে একটি ঘরে বসবাস করত। সারাটা মহল্লাই কাঁদছে। তবে ওটা কোনও নতুন ঘটনা নয়। করাচীবাসীদের ভাগ্যে তো কেবল স্বচক্ষে আত্মীয়- পরিজনদের মৃত্যু দেখাটাই যেন ভবিতব্য। সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে কোনওদিন অল্পবয়স্ক যুবক, কোনওদিন নববিবাহিতা যুবতী, তো কোনওদিন পরিবারের একমাত্র ভরণপোষণ করেন বা একমাত্র রোজগেরে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে চলেছে। কিছুক্ষণ সব শুনসান শ্মশানের নিস্তব্ধতা। কোনওসময় দরদহীন পুলিশের দেখা মিলে, কখনও তাও মেলে না। তাদের অন্তরে দয়ার লেশমাত্র নেই। শ্রমিক মহল্লা থেকে যখন কেউ কাজে বের হয়, তার কোনও নিশ্চয়তা থাকে না যে সে আদৌ ফিরবে কি ফিরবে না! করাচীবাসীদের কপালে হয়তো বা কান্না আর আর্ত চীৎকারই লেখা হয়ে আছে। গত ৫ জুলাই থেকে ৮ জুলাই এর মধ্যে ভাষাগত দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা মাত্র ৮৫ জন। এমনই খবর বিভিন্ন সংবাদপত্রে বের হয়েছে। মানুষ মারা যাচ্ছে, আত্মীয় পরিজনরা কান্নাকাটি করছে— কুশলবার্তা বলার, সান্ত্বনা দেবার লোক নেই। কেননা, করাচীতে এখন 'নিহত হয়েছে'— এটা আর কোনও খবরই নয়। ওতো কোনও না কোনওভাবে ঘটবেই, জানা যাবেই।

কোনও পাঠান অথবা উর্দিধারীরা গুলি করবে আর চলে যাবে। দোকানপাট-বাজার খুলে— অভ্যর্থনা হয় গুলিতে। গুলি কোথা থেকে কে চালাল তা কারও জানা নেই।

করাচীর আইন-শৃঙ্খলা তো সেদিনই খতম হয়ে গিয়েছিল যেদিন দেশভাগের পরই করাচী পাকিস্তানের রাজধানী হয়েছিল। ১৬ জুলাই 'টার্গেট কিলিং'-এর প্রথম দিন একশটা লাশ পড়েছে। দ্বিতীয় দিন দুশো। বোঝাই যাচ্ছিল না কে কার বিরুদ্ধে লড়ছে। কেবলই বন্দুক থেকে গুলি চলছে আর নির্দোষ মানুষ লুটিয়ে পড়ছে। করাচী জ্বলছিল, ধোঁয়ায় আকাশ ভরে যাচ্ছিল। করাচীর আত্মা সব দেখছিল আর মনে মনে জিজ্ঞাসা করছিল— ''এ জন্যই কি কায়দে আজম জিন্না পাকিস্তান বানিয়েছিলেন?"

'জামাতে ইসলামী'-র মুখপত্র 'দৈনিক জসারত'-এর সম্পাদকীয়-এর শিরোনাম ছিল— ''করাচী : বারুদের স্তূপের উপর।" ২৩ জুলাই সংখ্যায় লেখা হয়েছে— ''দেশের অর্থব্যবস্থার চালক ইঞ্জিনস্বরূপ করাচীই অশান্তির ফাঁসে আটকে গেছে। জুলাই মাস শেষ হয়নি এখনও, কিন্তু ৩৪০ জন নিহত।" ৪ আগস্ট লেখা হয়েছে— আগস্টের প্রথম সপ্তাহ শেষ হয়নি, ইতিমধ্যেই ৩৮ জনের শবযাত্রা হয়ে গেছে। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রহমান মালিক বারবার আশ্বাস দিলেও সরকার ওই সমাজবিরোধীদের শক্তির কাছে নিরুপায়। একদিকে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালু রেখেছে সন্ত্রাসবাদীরা আর অন্যদিকে সমাজবিরোধীরা। যারা করাচীকে মৃত মানুষের নগরীতে পরিণত করতে সদা সচেষ্ট। সমাধান বা শান্তির পথ কারও জানা নেই। এমনকী পাক-সেনাবাহিনীরও। যদিও তারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজ বীরত্বের জয়গান গেয়ে থাকে। করাচী গত ৩০ বছর যাবৎ পাকিস্তানী সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। হতে পারে করাচীবাসীরা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলো করাচীকে পৃথক করতে না বাধ্য হয়! করাচী পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হলে করাচীবাসীরা অন্য দেশের সাহায্যে সুখ-শান্তি বয়ে নিয়ে আসতে পারে। করাচী যদি পাকিস্তানের হাতছাড়া হয় তাহলে দেশের অর্থব্যবস্থা চৌপট হয়ে যাবে।

চিৎপুরের যাত্রাপালা এবার মমতাময়

বিকাশ ভট্টাচার্য

রথযাত্রার দিন চিৎপুরের প্রায় সব যাত্রাদলের পক্ষ থেকেই প্রচারিত হয়েছে তাদের নতুন পালার নাম এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তালিকা। প্রত্যেক বছরই যাত্রাপালায় নতুন নতুন বিষয় আসে— সমসাময়িক বিষয় বধূ হত্যা থেকে অশান্ত কাশ্মীর বা বিন লাদেন থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত মার্কিন বাণিজ্য কেন্দ্র। তবে এ বছর সব থেকে বেশি নজর কেড়েছে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিপূর্বে মার্কস, লেনিন থেকে শুরু করে শ্রীচৈতন্য, বিবেকানন্দকে নিয়ে যাত্রাপালা হয়েছে। তবে একেবারে জীবিত কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে কি পালাকাররা এভাবে মেতেছেন কখনও? মনে তো পড়ে না। আর এই হাওয়ায় গা ভাসিয়েছেন নতুন বা পুরানো সব দলই। কমলা ভট্টাচার্য এ বছর নতুন দল গড়েছেন আনন্দবীণা অপেরা। বাংলার এক নয়া ইতিহাস যিনি গড়লেন তাঁকে নিয়ে পালা তৈরির সুযোগ তিনি ছাড়বেন কেন? নতুন দলের জন্য এই মুহূর্তে এর চেয়ে চটকদার বিষয় আর কি হতে পারে? আনন্দবীণার পালা ‘বাংলার ক্ষমতায় এবার মমতা’। নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন অনেকটা মমতার মতোই দেখতে টিভি সিরিয়ালের অভিনেত্রী রুমা চক্রবর্তী। কার্তিক সামন্ত বরাবরই তাঁর পালায় বিষয়ের অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। এবার তাঁর দল দিগবিজয়ী অপেরার পালা ‘মহাসংগ্রামে জয়ী মমতা’। পালাকার বিশ্বজিৎ পুরকায়স্থ। এম. দাসের অঞ্জলি অপেরাতেও এবার মমতা। তাঁদের পালা ‘বাংলার মসনদে মমতা’। মুখ্য ভূমিকায় যাত্রাজগতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সীতা ঘোষ। গীতাঞ্জলি অপেরার ‘স্বপ্নের নেত্রী মমতাময়ী’ পালার মুখ্য চরিত্রে আর এক জনপ্রিয় যাত্রাশিল্পী মহুয়া ভট্টাচার্য। পালা

মমতা ব্যানার্জীর ভূমিকায় সীতা ঘোষ।

লিখেছেন এবং অভিনয়ও করছেন প্রবীণ শিল্পী নির্মল মুখোপাধ্যায়। সোনার তরীর এবারের পালা ‘‘বাংলার মমতা দেখো তার মমতা’’। আর মমতা ব্যানার্জীর স্নেহধন্য আর এক নাট্যকার-অভিনেতা ব্রাত্য বসু— তিনিই বা হাত গুটিয়ে থাকবেন কেন? তাঁর রচনা ও নির্দেশনায় শিল্পী মন্দিরের ‘বাংলা আমার মমতাময়ী’’ এখন মহলায়।

বাংলার প্রাচীনতম লোককথা এই যাত্রাপালা এখন ধীরে ধীরে তার নিজস্বতা হারাচ্ছে। বড়ো ফণী, ছোট ফণী, পূর্ণেন্দু, পঞ্চু সেন, জ্যোৎস্না দত্ত এমন কী এই সেদিনের স্বপনকুমার, দিলীপ চ্যাটার্জী, শান্তিগোপাল, বীণা দাশগুপ্তা যাত্রাভিনয়ের যে ট্র্যাডিশনাল ধারা ধরে রেখেছিলেন আজকের যাত্রাপালায় সেই ধারা বিলুপ্ত প্রায়। আজকের প্রযোজকরা সস্তা চটকের জন্য মুম্বাই থেকে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে প্যান্ডেল ভরানোর জন্য যাঁদের নিয়ে আসছেন তাঁরা আর যাই করুন— যাত্রাভিনয়ের ধার দিয়েও যান না। যেমন, এ বছর রত্নদীপ অপেরা তাঁদের ‘‘রূপসাগরের রূপসী’’ পালায় মুম্বাই-এর একসময়ের জনপ্রিয় নায়িকা রবীনা ট্যান্ডনকে নিয়ে আসছেন। এছাড়া বিতর্কিত মণিকা বেদী, স্বাতী পাল— এঁরাও যাত্রাপালায় অভিনয় করবেন।

টালিগঞ্জের কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী— যাঁরা এখন আর বড়ো পর্দায় তেমন সুযোগ পাচ্ছেন না, মরসুমী ফুলের মতো তাঁরাও যাত্রাপালায় নাম লিখিয়েছেন। এঁদের মধ্যে দেবশ্রী রায়, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, যীশু সেনগুপ্ত, অভিষেক চ্যাটার্জী, পাপিয়া অধিকারীরা আছেন। কয়েকমাস এ. সি. গাড়িতে যাতায়াত করে, এ সি হোটেলে থেকে লক্ষাধিক টাকা এরা রোজগার করে নেবেন মুমূর্ষু এই যাত্রাশিল্প থেকে। আর বছরের পর বছর যাত্রাশিল্পের সঙ্গে যুক্ত থেকে যারা

যাত্রালক্ষ্মীর সেবা করছেন— তাঁদের হাল একই থেকে যাবে। এঁদের জন্য প্রযোজকদের যেমন চিন্তা নেই— তেমনই রাজ্য সরকারেরও তেমন চিন্তা নেই।

তবু এতো কিছুর মধ্যেও কিছু গ্লামারাস যাত্রাশিল্পী— যাঁরা বছরের পর বছর শুধুমাত্র যাত্রাকে ভালোবেসে যাত্রায় আছেন, তাঁরা কিন্তু এ বছরও যাত্রাপালায় কিছু অভিনবত্ব আনছেন। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় তপন গাঙ্গুলীর। চলচ্চিত্র ও দূরদর্শনের এই ব্যস্ত শিল্পী অগ্রগামীর ‘‘মহামান্য আদালত ও একটি মেয়ে’’ পালায় রচনা ও নির্দেশনার সঙ্গে অভিনয়ও করছেন। এক প্রতিবাদী মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন তাপসী রায়চৌধুরী তাঁর নিজেরই নির্দেশনায় ‘‘সবুজদ্বীপের নয়নতারা’’ পালায়। প্রযোজনায় ভারততীর্থ যাত্রা সমাজ। এখনকার সময়ের জনপ্রিয় জুটি অনল চক্রবর্তী ও কাকলি চৌধুরী নয়নতারা অপেরার সামাজিক পালা ‘‘একদিন রাত্রে’’ পালায় অভিনয় করছেন। এঁদের পালায় কোনও সিনেমার গ্লামারের দরকার হয়নি। এঁদের অভিনয় দেখতে এখনও প্যান্ডেল উপচে পড়ে।

সংস্কার ভারতীতে অভিনয়ের পাঠ নেওয়া এবং সংস্কার ভারতীর নাটকে যাঁর প্রথম মঞ্চাভিনয় এমন নবীনা অভিনেত্রী শুভ্রতা এ বছর নায়িকার ভূমিকায় যাত্রায়

যোগ দিয়েছেন। রাজেশ্বরী অপেরার ‘‘একালের কর্ণঅর্জুন’’ পালায় চলচ্চিত্র নায়ক ইন্দ্রজিতের বিপরীতে তিনি অভিনয় করবেন। তেমনি যাত্রাজগতের কিংবদন্তী নির্দেশক-অভিনেতা ত্রিদিব ঘোষের সঙ্গে অভিনয় করছেন সংস্কার ভারতীর আর এক শিল্পী অজয় চক্রবর্তী। বাংলার প্রাচীনতম লোকশিল্পকে ভালোবেসে এঁরা যাত্রালক্ষ্মীর সেবা করুন, এই শুভকামনা হইল।

যাত্রাপালার ঐতিহ্যমণ্ডিত পরম্পরা আজ কতটা বজায় রয়েছে?

দেবাদিত্য চক্রবর্তী

একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়—যাত্রা শোনে ফাত্রা লোকে। শহরের শিক্ষিত মানুষের নাক সিঁটকানো ফাত্রালোকের যাত্রা, গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে।

শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষের কাছের মাধ্যম হয়ে উঠেছে থিয়েটার। কিন্তু এইসব নাটক সাধারণ কৃষক শ্রেণীর কাছে পৌঁছতে পারে না তার আঙ্গিকগত খোলস ভেঙে। তাই যাত্রার মেলোড্রামা, চড়া অভিনয়, নাচগান তাদের যে আনন্দ দিতে পারে, থিয়েটার ঠিক তা দিতে পারে না।

একসময়ে যাত্রা ছিল মূলত শ্রুতিকাব্য। যাত্রা লোকে শুনতে যেত। কিন্তু বর্তমানকালে যাত্রা হয়ে উঠেছে শ্রবণ ও দর্শনের সমন্বয়।

উৎপত্তিকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যাত্রার কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। শোনা যায় শ্রীচৈতন্যদেবও নাকি যাত্রা গান করেছিলেন। আবার অনেকের মতে কেঁদুলি গ্রামে শিশুরাম অধিকারী যাত্রায় নবপ্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। তার উত্তরকালে শ্রীদাস, সুবল, পরমানন্দ ইত্যাদি ব্যক্তিরা যাত্রার উজ্জীবনে ব্রতী ছিলেন। অবশ্য শিশুরামের আগেও যাত্রার দল ছিল। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে কোনও তথ্য জানা যায় না।

একদা কলকাতার কয়েকজন বিত্তবান নিজেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য একটি যাত্রাদল সংগঠন করেন। এই দলকে বলা হোত সখের যাত্রা। এই যাত্রাগুলি বিশেষভাবে লোকের কাছে আনন্দদায়ক ছিল এদের নতুনত্বের জন্য। পরবর্তীকালে যাত্রা যখন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, তখনও সখের যাত্রাদলের অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায়।

সখের যাত্রার ক্ষেত্রে কিংবদন্তী হলো বৌবাজারের জনৈক রাধারমণ। ১৮২২ সালে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় তাঁর পিতা রামজয়ের নামে যাত্রাদল গঠন করেন। এরপর মদনমাস্টারের দলের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৮৬৭ সালে বাগবাজারের গিরীশচন্দ্র ঘোষ, ধর্মদাস সুর, রাধারমণ কর প্রমুখ নাট্যরসিকরা মিলিত হয়ে একটি যাত্রাদল গঠন করেন। তাঁরা মধুসূদনের "শর্মিষ্ঠা" অভিনয় করেন।

পেশাদার যাত্রাকারদের মধ্যে সবচেয়ে সাফল্য লাভ করেছিলেন গোপালচন্দ্র দাস বা গোপাল উড়ে। সারা বাংলাদেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি বিদ্যাসুন্দর পালাটি অভিনয় করে খুব সুনাম অর্জন করেছিলেন। গোপাল দাস মূলত নারীর ভূমিকায় মধুর গান গাইতেন। তিনি কাওয়ালী ঢঙে গান গাইতেন এবং স্বরচিত গানে সুর দিতেন। বিদ্যাসুন্দর পালার জনপ্রিয়তা সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বাহক।

এছাড়া সেকালে কলকাতা শহরে দুর্গাচরণ ঘড়িয়ালের যাত্রাদল খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

অন্যান্য সাংস্কৃতিক আনন্দানুষ্ঠানের মতো যাত্রাতেও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গল্প নিয়ে পালা অনুষ্ঠিত হোত। রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন আখ্যান ছিল যাত্রার উপজীব্য বিষয়। পৌরাণিক ধর্মীয় বিষয়ে যে যাত্রা অনুষ্ঠিত হোত তা কৃষ্ণযাত্রা নামে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন পালা যেমন—নলদময়ন্তী, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

গ্রামীণ সংস্কৃতিতে মেয়েরা চিক্ দেওয়া পর্দার আড়ালে কিংবা পূজামণ্ডপে আলাদা স্থানে বসে যাত্রা দেখত। ঔপনিবেশিক কলকাতায় বৃটিশ প্রভুদের প্রভাবে পর্দাপ্রথা কিছুটা সরে যায়, মাইকেল মধুসূদনের "মায়াকানন" নাটকের জন্য বন্ধুরা যখন গোঁফ না ওঠা কিশোরের অনুসন্ধানে ব্যস্ত, তখন মধুসূদন বলেছিলেন, "বালক লইয়া অভিনয় করিলে অভিনয় কখনও স্বাভাবিক হইতে পারে না। স্ত্রী চরিত্রের স্ত্রীলোক লইয়া করাই কর্তব্য।"

শ্যামবাজার অঞ্চলের নবীনচন্দ্র বসু বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয় করান, সেখানে মেয়েরা প্রথম নারী ভূমিকায় অভিনয় করেন। মালিনীর ভূমিকায় পদ্ম, জীজাবাঈ হন বিদ্যা।

হুগলী কলেজের শিক্ষক ও পরবর্তীকালে যাত্রাকার মদনমাস্টারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী মদনমাস্টার গঠিত যাত্রাদল চালাতেন। এই দলের নাম ছিল "বৌমাস্টারের দল" এবং অনেকের মতে এটাই মহিলাদ্বারা পরিচালিত প্রথম দল।

যাত্রাকে লোকায়ত আঙ্গিক বলে গ্রহণ করলে সেই সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার উঠে আসে, যে যাত্রায় ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিষয়বস্তু যেভাবে

ব্যাপকহারে উঠে এসেছ, স্বদেশ চিন্তা বোধহয় ততটা উঠে আসেনি। তবু বলতে হয় প্রথম পর্যায়ে এই মাধ্যমে মানুষ সেইসব ঘটনাকে স্মরণ করত যা তাদের অস্তিত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। যেমন---দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে তাদের গাথায় গ্রামের মানুষের উপর অত্যাচার, অন্যের জমি দখল করে নিজের সম্পত্তি বাড়ানো ইত্যাদি বিষয় উঠে আসত। এই

“আজকের যাত্রামালিক শুধুই একজন ব্যবসায়ী। যেভাবে হোক মুনাফা লোটাই তাদের উদ্দেশ্য হয়ে গিয়েছে। যাত্রাশিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্য, তার সাংস্কৃতিক আবেদন এসবের কোন চেতনাই তাদের নেই। চিৎপুরের যাত্রা পাড়ায় তাই আজ শোভা পায় চলচ্চিত্রের নায়ক এবং অর্ধনগ্ন নায়িকাদের বড় বড় পোস্টার।”

সমস্ত পালায় স্থানীয় বীরদের গৌরব গাথা থাকত, মুঘল সম্রাটদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কাহিনী থাকত এমনকি কৃষকদের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাভাবনারও প্রতিফলন ঘটত। যাত্রায় ধর্মীয়, প্রেমমূলক, ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নিয়ে পালা অনুষ্ঠিত হলেও, ইংরেজ প্রভুদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন কথা শোনা যেত না।

যাত্রা জগতে সামাজিক চিন্তাভাবনার প্রথম প্রকাশ ঘটে মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রায়। মুকুন্দদাসের যাত্রাদল বিহার ও বাংলায় অভিনয়ের মাধ্যমে পল্লীসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার, দেশপ্রীতি ইত্যাদি প্রচার করতো। ওঁর একটি উল্লেখযোগ্য পালা ছিল—মাতৃপূজা।

মুকুন্দদাস ছাড়া আর যে দুজন যাত্রাকার স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পালা লিখেছিলেন তাঁরা হলেন, ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী ও হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের ‘‘রণজিত রাজার জীবন যোগ্য’’ ইংরেজ সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল। এছাড়া মথুর সাহা, ভূষণ দাস প্রমুখ যাত্রাকারেরা নিজেরা স্বদেশী নাটক না করলেও স্বদেশী বক্তব্য প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক পালা প্রতিটি স্তরে আন্দোলন করার জন্য তার সাংস্কৃতিক কাঠামো উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি।

তুলনামূলক আধুনিককালে বাংলাযাত্রায় কাঠামোর পরিবর্তনের পরীক্ষা- নিরীক্ষা চলছিল। এই পরিবর্তন শুরু হয় ভৃগুচরিত পালা থেকে।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় থিয়েটারের ভূতনাথ দাসকে টেনে আনেন যাত্রাদলে। তার ভৃগুচরিত পালায় প্রথমে থিয়েট্রিকাল ধরনের কয়েকটি গানের সুর রচনা করে যাত্রাভিনয় করান।

এরপর যাত্রায় আরও পরিবর্তন এলো। যেমন বর্জিত হলো ‘হাফজুরি’। তার বদলে এলো এক একজন গায়ক বা গায়িকা। তার নাম দেওয়া হলো বিবেক। এর পরবর্তীকালে যাত্রায় মাইক ও লাইটের যথেচ্ছ ব্যবহার, মঞ্চে বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের প্রবেশ ইত্যাদি যাত্রার মেজাজের বহুল পরিবর্তন সাধিত করে।

আজকাল কোনও সিনেমা হিট হলেই তা যাত্রায় চলে যাচ্ছে। যেমন--- এম এল এ ফাটাকেষ্ট ইত্যাদি। যাত্রায় যে এ সমস্ত ঘটছে তার কারণ, এই ধরনের পালা যাত্রা মালিকদের প্রচুর পয়সা দিচ্ছে। সমস্ত যাত্রার দল আজ উত্তরবঙ্গ, কাল মেদিনীপুর করে প্রচুর টাকার ব্যবসা করছে। কিন্তু এর কতখানি পায় যাত্রাশিল্পীরা? দু’একজন শান্তিগোপাল, স্বপনকুমার, অমুককুমার, তমুককুমার ছাড়া সাধারণ শিল্পীদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল এবং এখনও তাই আছে। পুরো সীজনে সবকটা শোয়ে অভিনয় করে যা টাকা তারা পায়, তা দিয়ে সারা বছর সংসার চলে না। যাত্রাশিল্পীদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীদের যাত্রায় প্রবেশে। বাংলা এবং হিন্দী চলচ্চিত্রের একাধিক জনপ্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রী যাত্রায় আসছে। দলে দলে দর্শক ভিড় করছে সিনেমার নায়ক নায়িকাদের স্বচক্ষে দেখার জন্য। যাত্রার মালিকেরাও এই ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন পালার গ্ল্যামার বাড়াবার জন্য, কারণ তার বিনিময়ে জুটবে মোটা টাকার ফায়দা।

তাছাড়াও ‘হাফজুরির’ বদলে যাত্রায় এখন স্বল্পবসনাদের মুম্বাই মার্কা নাচ আমদানী করা হয়েছে। যাত্রার পোস্টারে স্বল্পবসনাদের ছবি, শোয়ের আগে প্রচার করা হচ্ছে—সিনেমার হট গ্ল্যামার কুইন মিস অমুক ইত্যাদি ইত্যাদি। বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এইসব ব্যবসায়ীরা পরোক্ষ অপসংস্কৃতিই প্রচার করছেন।

আজকের যাত্রামালিক শুধুই একজন ব্যবসায়ী। যেভাবে হোক মুনাফা লোটাই তাদের উদ্দেশ্য হয়ে গিয়েছে। যাত্রাশিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্য, তার সাংস্কৃতিক আবেদন এসবের কোন চেতনাই তাদের নেই। চিৎপুরের যাত্রা পাড়ায় তাই আজ শোভা পায় চলচ্চিত্রের নায়ক এবং অর্ধনগ্ন নায়িকাদের বড় বড় পোস্টার। এক সময় ছিল যখন শান্তিগোপালের অভিনয় দেখে চিত্রপরিচালক ঋত্বিক ঘটক উদ্দীপিত হয়েছিলেন। আর আজ মুম্বাই-মার্কা বাংলা ছবির নকল তৈরি হচ্ছে সেই চিৎপুরে। পরিবর্তন সব মাধ্যমেই আসে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু যেটা ভাবায়—যাত্রাপালার এইরকম পরিবর্তন আদৌ কি ইতিবাচক এবং সমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকর?

(প্রচ্ছদ নিবন্ধের ছবি তুলেছেন শিবু ঘোষ)

ওয়েলো জল-চক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাজস্থানের গ্রামীণ এলাকার একটি করুণ চিত্রের দিকে প্রথমে চোখ ফেরানো যাক। গরম দুপুর, 'লু' নামক গরম বাতাস প্রবহমান, পায়ের নীচে তপ্ত বালুকারাশি, মাথার ওপর কলসী চাপিয়ে গ্রাম্য রমণীরা বহুদূরের প্রায় শুকনো কোনও পুকুর থেকে জল নিয়ে আসছেন। এদৃশ্য শুধু মরুপ্রধান রাজস্থানেরই বা বলি কি করে! সারা দেশেই ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর যে ভাবে নামছে, তাতে অচিরেই সারা দেশে এমন দৃশ্য দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। শুধু মরু এলাকাতেই নয়, গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবে গোটা বিশ্বেই এখন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমতির দিকে। সব মিলিয়ে পুরো পরিস্থিতিটা যেভাবে জটিল হচ্ছে তাতে আগামীদিনে পানীয় জল যে একটি দুর্মূল্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য হিসেবে বিবেচিত হবে, এটা হলফ করেই বলা যায়।

কলসী মাথায় রাজস্থানী মহিলাদের ডান পাশে জনৈকার হাতে রয়েছে 'ওয়েলো জল-চক্র'।

তবে রাজস্থানী রমণীদের জন্য কিছুটা সুখবর নিয়ে এসেছেন এক আমেরিকান রমণী। নাম সিনথিয়া কোয়িং। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্টের স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রী। যিনি মনে করছেন বর্ষাকালে সঠিকভাবে জল ধরে রাখতে পারলে কিংবা বহুদূরবর্তী কোনও পুকুরের জল অল্প আয়াসে গ্রাম-গ্রামান্তরে পৌঁছে দিতে পারলে এই জলের আকাল থেকে সামান্য হলেও স্বস্তি মিলবে। এহেন চিন্তার ফলশ্রুতি হলদে রঙের ওয়েলো ওয়াটার হুইল। ইংরেজি W-এর অনুপ্রাসটি এই মুহূর্তে বাজারে বেশ জনপ্রিয়ই হয়েছে। এই চক্রের (হুইল) মধ্যে ৯০ লিটার জল ধরতে পারে অনায়াসেই। জিনিসটাকে এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে যে, হলুদ রঙের একটা ড্রাম, সেটাকে গড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য ধনুকের ছিলার মতো বাঁকানো হাতল টাইপের যন্ত্রের ব্যবহার রয়েছে সেখানে। এতে সুবিধা এই যে ৯০ লিটার জল ঠেলার জন্য ১০ কেজি জল ঠেলার সামর্থ্য থাকলেই যথেষ্ট।

জাতিসঙ্ঘের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রতিদিন একটি লোকের পাঁচ গ্যালন করে জল লাগে। এই লেখার সঙ্গে যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে তার দিকে ভাল করে খেয়াল করুন। বাঁদিক থেকে চারজন মহিলা চিরাচরিত রাজস্থানী ট্র্যাডিশন মেনে মাথায় কলসী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, পাশে রয়েছেন সেই মহিলাটি যাঁর হাতে রয়েছে সিনথিয়া কোয়িং-এর অন্যতম সেরা আবিষ্কারটি। মাথায় রাখুন সেই চক্রে একবারে যে পরিমাণ জল আনতে সক্ষম হয়েছেন মহিলাটি, বাকিদের মাথার কলসিতে সবমিলিয়ে বড়জোর তার এক-চতুর্থাংশ জল ধরবে। অর্থাৎ কম আয়াসে ওই মহিলাটি যে পরিমাণ জল আনছেন, নিদেনপক্ষে বার চারেক কষ্ট না করে ওই কলসী মাথায় মহিলা'রা সেই পরিমাণ জল আনতে পারবেন না। বিশেষজ্ঞদের রায়, এই ধরনের জল-চক্র প্রকল্প (ওয়াটার হুইল প্রজেক্ট) ভারতে প্রথম ও অভিনব। বছর খানেক আগে এই গবেষণাকর্মের জন্য সিন্থিয়া প্রিন্সটন এন্ট্রিপ্রিনিউয়ার (উদ্যোগপতি) নেটওয়ার্ক পিচ, ২০১০-এ দ্বিতীয়স্থান অর্জন করেন এবং ডাউসাস্টেনেবিলিটি চ্যালেঞ্জ গ্রান্ট পুরস্কার বিজয়ী হন। এরপরেই তাঁর রাজস্থানে আগমন এবং সেখানকার গ্রামীণ বাসিন্দাদের নিদারুণ জলকষ্ট চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ করে এই আবিষ্কারের সার্থকতা খুঁজে পান।

এবার একনজরে আবিষ্কর্ত্রীর সম্বন্ধে কিছু তথ্যে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। সিন্থিয়া থাকেন লাতিন আমেরিকার দু'দেশ মেক্সিকো এবং গুয়াতেমালায়। বোঝাই যাচ্ছে, জলকষ্ট তাঁর নিজেরই অভিজ্ঞতালব্ধ। আফ্রিকায় দু'দশক আগে পেটি পেটজার এবং যোহান জোনকারের আবিষ্কার হিপ্পো ওয়াটার রোলার বাদ দিলে তৃতীয় বিশ্বের গরীব মানুষদের জন্য জল উদ্যোগ এই প্রথম। সিন্থিয়া'র দাবী, ভারতে ম্যানুফ্যাকচারিং-এর খরচ কম। তাই ওয়েলো রোলারটি স্থানীয় ভাবেই তৈরি করা সম্ভব। জানা যাচ্ছে, এনিয়ে যে পাইলট প্রোজেক্টটি তৈরি হচ্ছে, এর অব্যবহিত পরেই জল-চক্রটি ভারতে তৈরি হবে। দামও হবে বেশ সস্তা।

মনমোহন সিংজী, অপরের অসততাকে প্রশ্রয় দিলে চাপে তো পড়তেই হবে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
ভারত সরকার
নয়াদিল্লি

আপনি সত্যিই খুব চাপে আছেন। সেই শীতকালীন অধিবেশন থেকে শুরু। বাদল অধিবেশনেও আপনি নাস্তানাবুদ হলেন। দুর্নীতির ছায়া যেভাবে আপনার সরকারকে গ্রাস করেছে তাতে চাপে থাকারই কথা। আপনি অবশ্য সৎ। নিজের সম্পত্তির হিসেবও প্রকাশ করে দিয়েছেন। কিন্তু দুর্জনেরা বলছে নিজে সৎ হয়ে অসৎদের লালন-পালন করলে নাকি সেই সততার কোনও মূল্য নেই।

এই যে অমর সিং জেলে গেলেন। তা তো ওই কয়েকজন বিজেপি সাংসদ সংসদের ভিতরে টাকা দেখিয়েছিলেন বলে। কেউ কেউ বলছে, কত ছোটখাট দলের কত সাংসদ টাকা নিয়ে চেপে গিয়েছিল আর আপনাকে ভোট দিয়ে সরকার বাঁচিয়ে দিয়েছিল তা কে না জানে? আসলে সরকার বাঁচাতে যে আপনারা টাকা দিয়ে সাংসদ কেনা-বেচা চালিয়েছিলেন এখন সেটা ক্লাস ফোর-ফাইভের ছেলেও জানে।

যাই হোক, লোকপাল বিল নিয়ে আন্না হাজারের চাপমুক্ত হতে না হতেই অমর সিং-এর চাপ আপনাকে যে বেশ অস্বস্তিতে ফেলেছে তা বুঝতে পারছি। কিন্তু দেখুন আপনার প্রিয় শরিক তৃণমূল কংগ্রেস সেটা বুঝল না। শেষ বেলায় বাংলাদেশ সফর বয়কট করে চাপে ফেলে দিলেন আপনার প্রিয় বোন মমতা। সেই চাপ সামলাতে শেষ পর্যন্ত তিস্তা জলবন্টন চুক্তি স্থগিত রাখার পথেই হাঁটতে হলো কেন্দ্রকে। হাসিনার মুখে তিস্তা হাসি না দেখতে পেয়েও ঢাকায় দু'দিন বেশ চাপেই কাটাতে হয়েছে আপনাকে। শেষ দিন তো আবার দিল্লির বিস্ফোরণের খবর পেয়ে আরও চাপ বেড়ে গেল। সন্ত্রাস নিয়ে কথা বললে আপনার চাপ অনেক বাড়বে কারণ, সত্যিই তো আপনি কিছুতেই বিষয়টা ম্যানেজ করতে পারছেন না। নিরাপত্তার সব বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো হয়ে যাচ্ছে। আর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে গলার যে জোর থাকা দরকার সেটা যে আপনার বা আপনার সরকারের একেবারেই নেই তা সবাই জানে। সে বিষয়ে কথা না বলে বরং আপনার তিস্তা চাপ নিয়েই কথা বলা যাক।

শেষ বেলায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বেঁকে বসায় সত্যিই বিদেশের মাটিতে দেশের নাম পুড়েছে। ইউ পি এ-র দুই শরিকের মধ্যে এই লড়াইটা কিন্তু আর আপনাদের ঘরের কোন্দল রইল না। দেশের নামটাও জড়িয়ে গেল। সবাই ভাবল দেখেছ বিশ্বের বৃহত্তম দেশের এক রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের বোঝাপড়াটাই নেই। কী লজ্জা! কী লজ্জা!

সেটা যদি নাও হয় তবে তো আরও মারাত্মক প্রশ্ন উঠবে। তিস্তার জলবন্টন নিয়ে আপনারা এত ঢাকঢাক গুরগুর করলেন কেন বলুন তো? তিস্তার যে জল নিয়ে ভাগাভাগি করছিলেন আদৌ কি তিস্তায় অত জল আছে?

বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় জল-রাজনীতি। সেদেশের সাধারণ নির্বাচনও খুব দূরে নয়। তার আগে শেখ হাসিনা সরকারও চাইছিল তিস্তার জলে বেশি করে ভাগ বসাতে। কিন্তু হাসিনাকে খুশি করার ব্যাপারে কেন্দ্রের কোনও বাধ্যবাধকতা থাকলেও সেটা নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বরং রাজ্যের স্বার্থ দেখা তাঁর কাছে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। সত্যি প্রধানমন্ত্রী স্যার, মমতার জেদের কাছে কেন্দ্রকে মাথা নোয়াতে দেখে আমার একদম ভালো লাগেনি।

সিকিমের কাংসে হিমবাহ থেকে আসা ত্রিস্রোতা নদী তিস্তা বাংলার ১২৩ কিলোমিটার পথ বেয়ে গেছে বাংলাদেশে। সেই নদীর বিস্তীর্ণ অববাহিকার মধ্যে পড়ে এ রাজ্যের ছটি জেলা। তিস্তার জল দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার ও মালদহের চাষবাসে বড় উৎস। আর সেই জলে বাংলাদেশ বেশি করে ভাগ বসালে মুশকিলে পড়বেন তিস্তা পারের চাষিরা। কথা ছিল বাঁধ তৈরি হলে সারা বছর ৪০০ কিউসেক করে জল পাবে বাংলা। কিন্তু সে বাঁধের কাজ সামান্যই এগিয়েছে। এখন সারা বছর গড়ে ১১০ কিউসেক করে তিস্তার জল পায় বাংলা। সেচ প্রকল্পের কাজ কবে শেষ হবে কে জানে?

এতো গেল তিস্তা কাঁটা। বিদ্ধ হয়েছেন আপনি। কিন্তু আপনি যে কাঁটা বাংলার গায়ে বিঁধিয়ে দিলেন তাতে তো কিছুদিন পর শরশয্যায় শুতে হবে পশ্চিমবঙ্গকে। তা নিয়ে অবশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ খোলেননি। খুলবেনও না। তাতে তেনার প্রিয় মুসলিম ভাইদের আক্রমণ করা হয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী মশাই আপনি ২৪ ঘণ্টার জন্য তিনবিঘা করিডর খুলে দিলেন। এনিয়েও কি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন?

তিনবিঘা করিডর নিয়ে ১৯৯২ সালে ২৬ জুন ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। সেদিন থেকে এদেশের মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাংলাদেশি ছিট দহগ্রাম ও আঙ্গারপোঁতার মানুষ ওই করিডোরের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে যাতায়াত করতে পারে। প্রথমে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এক ঘন্টা অন্তর অন্তর খোলা ও বন্ধ হোত পথ। পরে অবশ্য ১২ ঘন্টা টানা করিডর খোলা রাখার সিদ্ধান্ত হয়। এবার সেটা আপনি দিনের পর রাতেও অবাধ করে দিয়ে এলেন। দহগ্রাম ও আঙ্গারপোঁতার চারপাশে কোনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। ফলে করিডর দিয়ে ভারতের যে কোনও জায়গায় চলে যাওয়াটাও বাংলাদেশিদের জন্য সহজ। দিনের যাতায়াতেই নানা অসামাজিক কাজ এবং চোরাচালানের বৈধ পথ হয়ে উঠেছিল ওই করিডর। এবার তো রাতের অন্ধকারেও চলবে একই কাজ। সামান্যতম ভয়টুকুও আর রইল না। করিডর চালু হওয়ার পর থেকেই কোচবিহার জেলার কুচলিবাড়ি বা মেখলিগঞ্জ এলাকায় চুরি ডাকাতি, পাচার বেড়ে যায়। দিনের আলোয় কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ছিল। এবার সেটাও থাকল না। তিনবিঘা করিডর ২৪ ঘন্টা খোলা রাখার এই চুক্তিতে তো শুধু কোচবিহার জেলা বা পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বও প্রশ্নের মুখে পড়বে। আবার কি চাপ বাড়ালাম? তাহলে মাপ করবেন।

নমস্কারান্তে,
—**সুন্দর মৌলিক**

রাজ্য সরকারের মদতে অসমে বাংলাদেশীদের বাড়-বাড়ন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাজ্যের জনগণনার সরকারি পরিসংখ্যান তুলে ধরে এবার রাজ্য সরকারকে বাংলাদেশীদের বহাল তবিয়তে অসমে লালন- পালনের অভিযোগ করলেন বিজয়া চক্রবর্তী। তিনি অসমের গুয়াহাটি থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে লোকসভায় নির্বাচিত সাংসদ এবং দলের সর্বভারতীয় সহ-সভানেত্রী।

সম্প্রতি গুয়াহাটিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, অসমে গত দশ বছরে 'বাংলাদেশীদের' সংখ্যাটা ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০১-এর সেনসাসে অসমের জনসংখ্যা ছিল— ২,৬৬,৫৬০০০ জন। ২০১১-এর জনগণনায় রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে— ৩,১১,৬২০০০ জন। রাজ্যের জনসংখ্যা বেড়েছে ৪৫,০৬,০০০ জন।

সরকারি পরিসংখ্যান, খাতাপত্র, ডকুমেন্ট অনুসারে রাজ্যে জন্মহার ২৩ শতাংশ। কিন্তু তা ধরে জনসংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাত ৩৮ শতাংশ। তাহলে অতিরিক্ত ১৫ শতাংশ, লোকজন কোথা থেকে এল— বলে প্রশ্ন তুলেছেন শ্রীমতী চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য, ''এটা মোটেই স্বাভাবিক বৃদ্ধি নয়। এর কারণ অবশ্যই বাংলাদেশী ফ্যাক্টর। এটা গত দশ বছরে রাজ্যের কংগ্রেসী সরকারের পক্ষ থেকে অসমকে প্রদত্ত উপহার!''

শ্রীমতী চক্রবর্তী প্রশ্ন তুলেছেন, নির্বাচনের আগে তরুণ গগৈ দেশপ্রেমের যে সব ললিত বাণী শুনিয়েছিলেন এখন তার কি হলো? নির্বাচনের পর কি সব উবে গেল? এখন মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় রাজ্যের ৬৫১ একর জমি বাংলাদেশকে তুলে দিচ্ছে (এই সংবাদ ২ সেপ্টেম্বর-এর)। ধুবড়ি ও করিমগঞ্জ জেলার ভারতীয় এলাকা বাংলাদেশ জবরদখল করেছে। সে সব জমি ফেরত চাওয়ার পরিবর্তে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আরও জমি প্রতিবেশী দেশকে তুলে দিচ্ছেন। শ্রীমতী চক্রবর্তী আরও বলেন, যে সময় আই এম ডি টি আইন সংশোধিত হয়েছিল (Repealed) তখন অসমে দু'লক্ষ বাংলাদেশী ছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার মাত্র ১২০০০ জনকেই চিহ্নিত করতে পেরেছিল। বাদবাকীদের কি হলো? যতদিন পর্যন্ত না জাতীয় নাগরিক সূচী 'আপ টু ডেট' করা হচ্ছে ততদিন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপারটার সমাধান হবে না। একাজে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার-উভয়েই ন্যূনতম প্রয়াস করছে না।

অসমের সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে— আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কি সত্যিই অসমের মুখ্যমন্ত্রী? এভাবেই সাংসদ ও বিজেপি নেত্রী সাংবাদিকদের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন। শ্রীমতী চক্রবর্তী আরও বলেন, তিনি সংসদে বাংলাদেশীদের কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান জবরদখল ও গণ্ডার শিকারের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। সরকার পক্ষ থেকে মন্ত্রী অম্বিকা সোনী উত্তরে বলেছিলেন— দুটোর কোনওটাই ঘটেনি। অবাক কাণ্ড! এসবই রাজ্য সরকারের ভুল তথ্য প্রদানের ফল বলে তিনি অভিহিত করেন।

সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নিয়ে তিনি বলেন, তাঁর প্রাপ্য ৫ কোটি টাকা থেকে তিনি মোট ৪৬২টি প্রকল্প অনুমোদন করিয়েছেন। তবে রাজ্যে উপর থেকে নীচে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত দুর্নীতি ছেয়ে গেছে বলে শ্রীমতী চক্রবর্তী মন্তব্য করেন। তাঁর মতে অসমেও একজন আন্না হাজারের প্রয়োজন।

প্রায় দু'লক্ষ বিদেশী নিখোঁজ অসমে

সংবাদদাতা॥ সম্ভবত অসমেই এমনটা ঘটতে পারে। ১,৮৯,২১৮ জন সন্দেহাস্পদ নাগরিক রাজ্য থেকে বেপাত্তা। ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে ওদের 'নাগরিকত্ব সন্দেহজনক' বলে মামলা চলছিল। রাজ্য পুলিশ অথবা রাজ্য সরকারের তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে কারুরই কিছু জানা নেই।

গুয়াহাটি হাইকোর্ট রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ২,০১,৭০৫ ভোটারের নামের পাশে 'ডি' (Doubtful) ছাপার নির্দেশ দেয়। রাজ্য এদের বিরুদ্ধে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করেছিল। গত বিধানসভা নির্বাচনে তাদের ভোটদানে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল— যেহেতু তাদের নাগরিকত্ব সন্দেহজনক। তখনই ওই নিপাত্তা হওয়ার ঘটনা নজরে আসে। হাইকোর্টের নির্দেশের প্রত্যুত্তরে রাজ্য নির্বাচন কমিশন রাজ্য পুলিশের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। সেখানেই ২,০১,৭০৫ জন সন্দেহাস্পদ নাগরিকত্বের বিষয়টি উঠে আসে। এরপর যখন রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের অফিসাররা ভোটার তালিকায় উপরোক্ত ব্যক্তিদের নামের পাশে 'ডি' বসানোর কাজ শুরু করে তখন মাত্র ১২,৪৮৭ জনের নামই ভোটার তালিকায় খুঁজে পায়। অর্থাৎ নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ রয়েছে এরকম ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ২১৮ জনকে খুঁজে পাওয়াই যাচ্ছে না। এরপর যে, ১২,৪৮৭ জনের নামের পাশে 'ডি' বসানো হলো তাদেরকে বিগত বিধানসভা নির্বাচনেও ভোট দিতে দেওয়া হয়নি।

সূত্রমতে, নির্বাচন দপ্তর আগেই রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং পুলিশ বিভাগকে বিষয়টি জানিয়েছিল। তা সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ২১৮ জনের কোনও হদিশ নেই। অসমের জনারণ্যে প্রায় দুলক্ষ মানুষ হারিয়ে গেল। রাজ্য সরকার এবিষয়ে কিছুই করেনি। যদি ও ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল ১,৮৯,২১৮ জনকে বিদেশী বলে চিহ্নিত করে তবুও পুলিশ যে তাদের খুঁজে পাবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। আসলে যখনই পুলিশ কোনও সন্দেহাস্পদ নাগরিকের বিরুদ্ধে কেস নথিভুক্ত করে তখনই ভুল করে। তাদের কথামতোই ঠিকানা লিখে থাকে, তা আর যাচাই করা হয় না। ফলে সহজেই সন্দেহভাজনরা জনসমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। এদেশেই থেকে যায়।

অনেকবার হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল ওই সন্দেহভাজন নাগরিকদের আটক করে রাখার। তা মানা হয়নি। ফলে অবৈধ অভিবাসীদের সংখ্যা অসমে ব্যাপকহারে বেড়ে চলেছে। সরকারের অবহেলার কারণে বিদেশীতে দেশ ভরে যাচ্ছে।

চিঠিপত্র

প্রাথমিক শিক্ষকরা অবিচারের শিকার

রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষকদের একাংশ গত বাম সরকারের অপদার্থতার কুফল এখনও ভোগ করে চলেছেন। কারণ তৎকালীন বাম সরকার পি টি টি আই সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারেনি। অথচ অর্থের বিনিময়ে বি. এড্ সমস্যার সমাধান সে সময় অনেকটাই হয়ে গেছে। বাম আমলে যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা পি টি টি আইগুলোকে কেন্দ্রীয় এন সি ই আর টি-র নিয়ম অনুযায়ী দু-বছরের কোর্স করার অনুমতি দিলেও অনেক সরকার অধিকৃত পি টি টি আই-কে অনুমতি দেয়নি। এর কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণও নেই। এন সি ই আর টি ১৯৯৫ সাল থেকেই দু'বছরের পি টি টি আই কোর্স বাধ্যতামূলক করে। কিন্তু ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এরাজ্যেও দু'বছরের পি টি টি আই কোর্স চালু করার কোনও উদ্যোগ নেয়নি তৎকালীন বাম সরকার। এমতাবস্থায় মহামান্য হাইকোর্ট রাজ্যে এন সি আর টি-র অনুমোদনহীন পি টি টি আই সংস্থাগুলোকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে। যার ফলে ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষের পি টি টি আই-তে শিক্ষণরত শিক্ষক-শিক্ষিকারা এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যান। শুধুমাত্র এ রাজ্যেই সরকারীভাবে সুনির্দিষ্ট আদেশনামা এখনও জারি হয়নি। এমতাবস্থায় যদি ২০০৪-২০০৫ সালের ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা পর্যন্ত ট্রেনিং-এর সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন তবে ২০০৫-২০০৬ সালের শিক্ষারত শিক্ষক-শিক্ষিকারা সদ্য প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও কেন ট্রেনিং এর সুযোগ-সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন? এখন নবগঠিত রাজ্য সরকারের কাছে সুবিচারের আশায় প্রাথমিক শিক্ষকরা।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

শিক্ষা-সংস্কার

পরীক্ষা-নির্ভর অধ্যয়ন-প্রবণতার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি পরীক্ষা-নিরপেক্ষ পঠন-পাঠনেরও সমান গুরুত্ব রয়েছে অর্থাৎ এই দুইয়ে মিলে একটা সম্পূর্ণ বৃত্ত তৈরি হয় এবং এই দুইয়ের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত একটা যে মানবিকতা থাকে তার পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে, নতুবা কেবল পরীক্ষানির্ভর অধ্যয়নের মাধ্যমে তার শিক্ষা নিতান্ত যান্ত্রিক হয়ে পড়ে (যা এখন ঘটছে, যদিও ভিন্ন কারণে), আবার কেবল জেনারেল পরীক্ষা-নির্ভর অধ্যয়নের ফলে তার শিক্ষা এবং মননশীলতায় একপ্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। তাই বলছি, এই দুইয়ের মেলবন্ধনে একটা harmonious unification গড়ে দিতে হবে।

বস্তুত স্বাধীনতা-উত্তর শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অবাঞ্ছিত ঘটনাই ঘটে চলেছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। ফলে প্রাক্ স্বাধীনতার সময়ে যে শিক্ষাক্রম গড়ে উঠে চালু ছিল তা ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেছে। আমার মতে তা-ই ছিল মোটামুটি আদর্শ কাঠামো (যদিও সে শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল মেরুদণ্ডহীন কতকগুলি কেরানী তৈরি করা। কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাতে স্পর্শ পড়েছিল স্যার আশুতোষের মতো এমন কিছু মনীষী-যাঁদের তুলনা মেলা শক্ত)। ওই শিক্ষাব্যবস্থায় যেসব অশেষ কল্যাণ হতে পারতো। ওই শিক্ষাক্রমে একটা জাতীয় চরিত্র বিধৃত করার চেষ্টা ছিল। নেতাজীও চেয়েছিলেন, স্বাধীন ভারতে একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যার মধ্য দিয়ে এ দেশ একাত্মতার ভাবনা গড়ে উঠবে। দুর্ভাগ্যক্রমে তার চেষ্টাই হয়নি। সংক্ষেপে যেটা বলতে চাই তা হলো— প্রতি বৎসর একটি বাৎসরিক পরীক্ষা নিতে হবে, তাতে পাশ ফেল অবশ্যই থাকবে। মাঝে তিনটা Terminal পরীক্ষা থাকবে। এই পথে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর গুণগত উন্নয়নের প্রবণতা তৈরি হবে। আর তার অবর্তমানে প্রত্যেকে মধ্যমমানের শিক্ষার্থীতে পর্যবসিত হবে। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

—ডাঃ কে পি রায়, ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন, হাওড়া-৪।

ইসলামের পথে পশ্চিমবঙ্গ

গত ১৫ আগস্ট ২০১১ সংখ্যায়, উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ইসলামের পথে ভারত-পশ্চিমবঙ্গ : সাচারের পরামর্শ শিরোনামে সুলিখিত এবং সুচিন্তিত প্রবন্ধ পড়ে অনেক কিছু জানতে পারলাম। যারপর নাই খুশী হলাম এই মনে করে যে উচ্চশিক্ষিত অনেক হিন্দু এখনও আছেন, যাঁরা সমগ্র হিন্দুজাতি এবং ধর্মের জন্য চিন্তা-ভাবনা করেন তা না হলে হিন্দুরা অনেক আগেই বিলুপ্ত প্রায় হয়ে যেত যেমন হয়েছে বর্তমান পাকিস্তানে এবং কাশ্মীরে।

১৯৪৬ সাল হতে জাতীয় স্তরে এবং বর্তমানে কি কংগ্রেস ও অকংগ্রেসী রাজনীতির নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শুধু রাজসিংহাসন দখলে রাখার জন্য একযোগে হিন্দুধর্ম ও জাতিকে নির্মূল করতে একের পর এক হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। বর্তমানে কে বেশি মুসলমান দরদী, তার প্রতিযোগিতা চলছে শুধু ভোটের দিকে তাকিয়ে।

মৌলানা আজাদের মতো শিক্ষিত কিছু মুসলমান কংগ্রেস নেতা কোনও সময় দেশ ভাগ চাননি। মিঃ জিন্না ও প্রথমদিকে দেশভাগ ও দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন না। তাঁর জন্ম-বংশধারার সঙ্গে উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁকে প্রথমদিকে উদারপন্থী বলেই মনে হয়। কিন্তু ওই যে প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসনটা দুজনেরই দরকার— কাজেই দেশভাগ ছাড়া উপায় কি? লোভ ও ক্ষমতালিপ্সা সেই সঙ্গে ইংরেজদের কূটবুদ্ধি আর জহরলালের মাউন্টব্যাটন-পত্নীর প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া এই ত্রয়ী কাজ করেছে।

দেশভাগ না হলে বিরাট সংখ্যায় হিন্দু নিধন ও হিন্দু নারী ধর্ষণ, খুন ও অপহরণ এসব কিছুই হোত না। আবার যদি দেশ ভাগই হলো— তাহলে খুব ধীরেসুস্থে চিন্তা-ভাবনা ও সময় নিয়ে করা হলো না কেন যাতে কোনও পক্ষের অসুবিধা না হয়। এর জন্য কংগ্রেস নেতাদের অদূরদর্শিতা ও লোভই অতিমাত্রায় প্রকট।

ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে এবং নিজের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা হতে যেটুকু জেনেছি তাতে অধিকাংশ মুসলমান শান্তিতে এদেশে বাস করতে ও কাজ-কারবার করতে আগ্রহী। জাতি হিসাবে কর্মঠ-সাহসী-বলিষ্ঠ এবং কষ্টসহিষ্ণু এবং প্রয়োজনে সংগঠিত। আর হিন্দুরা শতধা বিভক্ত দুর্বল এবং ধর্মপরায়ণ ও অসংগঠিত— আমরা নিজেদের আত্মরক্ষার উপায় না ভেবে— চোখ বুজে ধ্যান করি। হিন্দুরা সংগঠিত হলে সুলতান মামুদ কি সতেরোবার ভারত আক্রমণ করতে পারে না। সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস করতে সাহস পেত? সেই রাজা দাহিরের আমল হতে জয়চাঁদ-পৃথ্বিরাজ-বর্তমানে আমরা, কোনও জ্ঞাতিশত্রু প্রয়োজনে নিজের ভাই অথবা প্রতিবেশীকে শিক্ষা দিতে মুসলমান গুণ্ডাকে টাকা দিয়ে বাড়িতে ডেকে আনে।

পরিশেষে বলি শুধু সাচার কেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হতে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এখন সংখ্যালঘু তোষণের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। ২৭ আগস্ট মা-মাটি- মানুষের সরকারের ১০০ দিনে (১০, ০০০) দশ হাজার মাদ্রাসার অনুমোদন হয়ে গেছে। আর সংখ্যার দিক দিয়ে ওরা তো বেশী হবেই কারণ যত বড় লোক হিন্দু হোক— সন্তান সংখ্যা এক-বড় জোর দুই। আর মুসলমানদের গড় সন্তান সংখ্যা ছয়, আর বিশ্ব ইসলামিক সংগঠন প্রায় ১৫-২০ বৎসর আগে সেটাই বলেছে যে— ভারতে তোমরা সংখ্যা বাড়াও।

—বিনয় কুমার মণ্ডল, স্বাধীনপুর, বীরভূম।

নিষ্ক্রিয় হিন্দু

ভারতবর্ষে মুসলিমের অনুপ্রবেশ আজ থেকে প্রায় ১০০০ বছর আগে। ক্রমে তার সমগ্র ভারতবর্ষটাকে নিজেদের অধিকারে আনে। এবং প্রায় ৮০০ বছর শাসনও করে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে ভারতের এক-তৃতীয়াংশ মুসলিম রাজ্যে পরিণত করে যা বর্তমানে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান নামে পরিচিত। অতীতের মুসলিম শাসকদের সঙ্গে আজকের তালিবানীদের অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সময়ের ফালে অতীতের মুসলিম শাসকদের ভারতীয় তথা হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি এবং হিন্দুদের ওপর বর্বর অত্যাচারের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেলেও এবং সেইসঙ্গে বিশ্বের মানুষের কাছে খুব বেশি প্রচারিত না হলেও আজকের তালিবানী কর্মকাণ্ড সে তুলনায় খুব সামান্য। তবে সমগ্র বিশ্বকে ইসলামী জেহাদীর নামে সমগ্র মুসলিম মৌলবাদী কর্মকাণ্ড যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে তা বিশ্ববাসীর কাছে অজানা নয়। হিন্দু তার হিন্দুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। মুসলমানরা মুসলিম রাজ্যের দাবী করলে হিন্দুরা হিন্দু রাষ্ট্রের কথা মুখেও আনে না। মুসলমানদের দাবী মতো ভারতবর্ষে আজও আলাদা আইন, শিক্ষা, চাকুরীতে আলাদা সংরক্ষণ, এমনকী ভারতীয় সংবিধানকে অবজ্ঞা করে নির্বিচারে গো-কুরবাণী করা হয়। সরকারী খরচে মুসলমানদের জন্য মক্কায় হজ করতে যাবার ব্যবস্থা আছে অথচ হিন্দু তার দেশে তীর্থ কর দিতে বাধ্য হয়। তথাপি হিন্দুর কোনও প্রতিবাদ নেই। হিন্দুর সামনে এবং পিছনে দুদিকেই বিপদ। সামনে কুসংস্কার এবং অপসংস্কৃতি আর পিছনে মুসলমান।

—বিজয়চন্দ্র দে, ডায়মন্ডহারবার।

গান্ধী-ভক্তি এবং বি জে পি

আজকাল প্রায়ই দেখা যায় বিজেপি নেতারা গান্ধী প্রশস্তিতে মুখর, কি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কি রাজ্য নেতৃত্ব। স্থানীয় নেতারা যখনই কোনও আন্দোলনের সামিল হন তখন গান্ধীমূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেন। আমার মতে, যে গান্ধী হিন্দুদের সবচেয়ে ক্ষতি সাধন করে মুসলিম তোষণের মধ্য দিয়ে দেশভাগ ত্বরান্বিত করেছেন তার ভজনা করা বিজেপি কর্মী এবং সমর্থকদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। যে হিন্দুত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি ২ থেকে ১৮২ পর্যন্ত উঠেছিল সেই হিন্দুত্ব ত্যাগ করে বিজেপি আবার সাপ-লুডুর মতো ১৮২ থেকে ২-তে নেবে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। এখানে হিন্দুত্ব কি জিনিষ একটু ব্যাখ্যা করা দরকার, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন— ''হিন্দুত্ব মানে ভারতীয়ত্ব''। বিজেপি আজও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে ভুলে গান্ধী ভজনা আরম্ভ করেছে। তাতে লোকের মনে ধারণা হয়েছে, যখন বিজেপি এবং কংগ্রেসের অর্থনৈতিক দিক থেকে চিন্তাধারার কোনও পার্থক্য নেই, তখন কংগ্রেসকে ভোট দেওয়াই শ্রেয়। বিজেপি-কে যদি ঘুরে দাঁড়াতে হয় তবে অবশ্যই হিন্দুত্বে (ভারতীয়ত্বে) ফিরে আসতে হবে। এবং গান্ধীর পরিবর্তে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তির পাদদেশে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করতে হবে।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা-৬৪।

গীতা

প্রখ্যাত পণ্ডিত ও পরম ভক্ত ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী নিউইয়র্ক স্টেটের একটি শহরে বক্তৃতা দিতে গিয়েছেন। বক্তৃতার পূর্বে গ্রন্থাগারিক হিউম সাহেব তাঁকে গ্রন্থাগারে ডেকে একটি বিশেষ কক্ষ দেখালেন যার গায়ে লেখা আছে 'গীতা সেক্‌শন'। সাহেব আলমারি খুলে বললেন— ''দেখুন, এইবার আপনাদের গীতা। বিভিন্ন প্রকারের প্রায় দেড় হাজার আমাদের আছে। আমরা গীতাকে শ্রদ্ধা করি। এখানে সপ্তাহে একদিন গীতার ক্লাস হয়।'' হিউম আরও জানান, ''পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির ভাষায় গীতা অনুদিত হইয়াছে। পৃথিবীর ধর্মশাস্ত্রের বাজারে বাইবেলের বিক্রয় সর্বাধিক। তারপরে গীতার স্থান।''

কিছুক্ষণ পর যথাসময়ে সভা আরম্ভ হলো। মহানামব্রত মহাশয় গীতার প্রসঙ্গ তুললেন, হিউমের কথাও এল। বললেন— ''এইমাত্র লাইব্রেরীর মি, হিউম আমাকে বললেন যে, ধর্মশাস্ত্রের বাজারে বাইবেলের পরেই গীতার স্থান। এই কথা ধরিয়া আমি একটি নূতন সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি। সিদ্ধান্তটি হইল এই যে, বাইবেল অপেক্ষা গীতার মর্যাদা অধিক।... আপনাদের বাইবেল যে বাজারে চলে, তাহার পিছনে আছে বাইবেল সোসাইটির লক্ষ লক্ষ ডলার; আছে পাদ্রী মিশনারীদের অক্লান্ত খাটুনি। পক্ষান্তরে, গীতার পিছনে এইরূপ কিছুই নাই। একটি বস্তু বলিতে পারে দুই প্রকারে— হয় ঠেলা, না হয় টান। হয় Push না হয় Pull। গীতা চলিতেছে বিশ্ব মানবের প্রাণের টানে। কাহার মহত্ত্ব কিরূপ, আপনারাই বিচার করুন।'' কারও কারও এতে অসন্তুষ্ট হওয়ার কথা। কিন্তু তা হলো না। সকলের মুখে আনন্দের হাসি দেখা দিল।

সভার শেষে বহু সজ্জন তাঁর আশে পাশে ভিড় জমালেন। অনেকে করমর্দন করে বললেন— ''আমরা গীতা ভালবাসি।''

—উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল, শেওড়াফুলি, হুগলী।

ইউরোপের দেশে দেশে
ইতালি, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী

।।পর্ব — ১।।

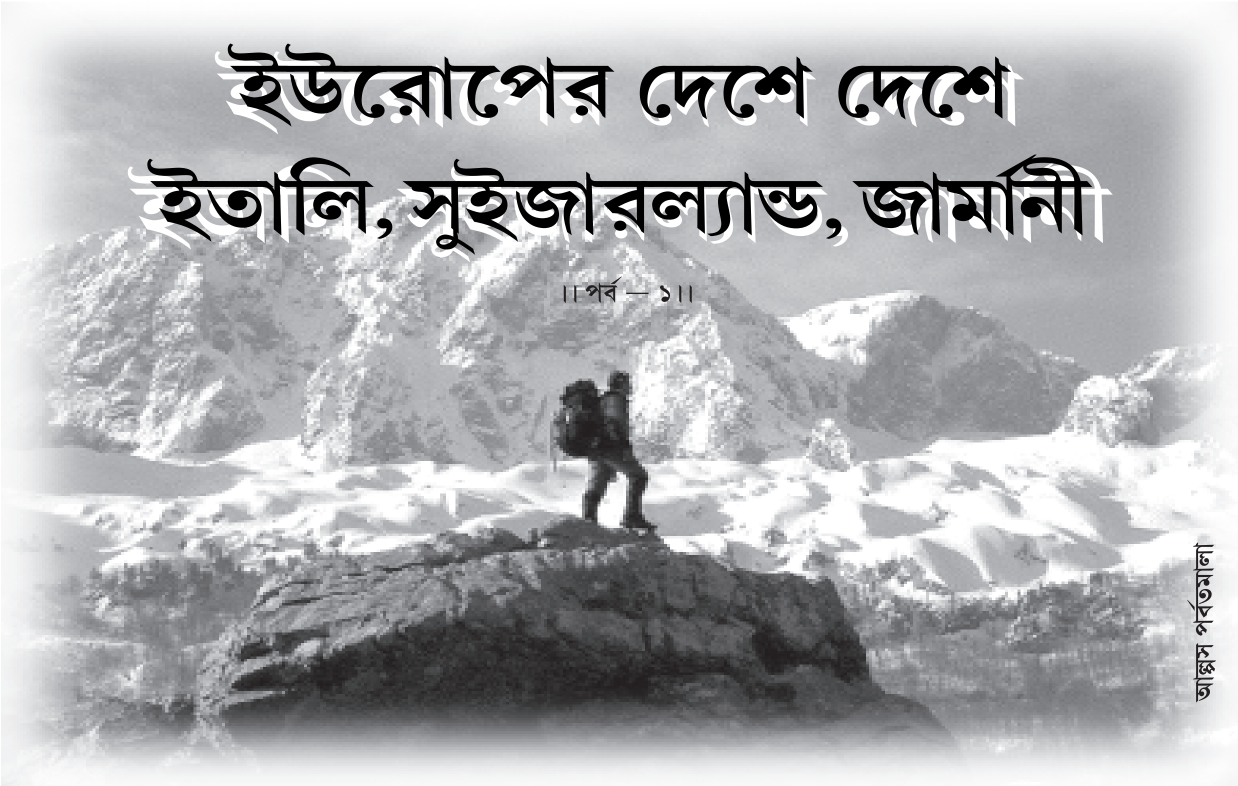

আল্পস পর্বতমালা

হিতেন্দ্র কুমার ঘোষ

২০০৮ সালে দুর্গা পূজার আগে ডাঃ শুভাশিস বিশ্বাসের কাছে ই সি জি করাতে গিয়েছি। উনি বললেন পুজোতে কোথাও যাচ্ছেন নাকি? আমার গিন্নি উত্তরে বললেন, 'ভারতবর্ষ তো মোটামুটি বেড়ানো হয়েছে, এবারে গেলে ভারতের বাইরে যাব।' ডাক্তারবাবু বললেন, যাবেন? আমার এক সহকর্মী ডাঃ এ. কে. গড়াই এস ও টি সি'র সঙ্গে ইউরোপ বেড়াতে যাচ্ছেন। যথারীতি ডাক্তার গড়াইয়ের ঠিকানা এবং ফোন নম্বর নিয়ে যোগাযোগ করে সব জেনে নিলাম। পরের দিন সল্টলেকে এস ও টি সি'র অফিসে গিয়ে বিস্তারিত জানার পর মনঃস্থির ক'রে ফেললাম আমরাও ইউরোপ বেড়াতে যাব। এস ও টি সি'র অফিসেই আলাপ হলো গুরুশরণ দাশগুপ্ত বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনিও আমাদের সঙ্গে ওই একই বিমানে ইউরোপ বেড়াতে যাবেন। দাশগুপ্তবাবু এবং আমরা ইউরোপের ছয়টি দেশ (ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড এবং লন্ডন) ভ্রমণ করবো।

২ অক্টোবর গভীর রাতে দিল্লী থেকে আমাদের বিমান ছাড়ল। পরেরদিন সকাল ৮-৩০ মিনিটে আমরা দুবাই বিমান বন্দরে পৌঁছালাম। সেখান থেকে আমিও বেলা ১১টায় বিমানে চড়ে বিকেল ৪টে নাগাদ ইতালীর মার্কোপোলো বিমান বন্দরে পৌঁছিয়ে দেখি এস ও টি সি'র গাইড নিশিকান্তবাবু অপেক্ষা করছেন। তিনি আমাদের স্বাগত জানালেন। বিমান বন্দরেই Mirando Bus (Air Conditioned) দাঁড়িয়েছিল আমাদের জন্য। সেই বাসে চড়ে আমরা পাভেদা শহর ঘুরে দেখলাম, পোলো শপিং মার্কেট ঘুরে দেখার পর আমাদের হোটেল ফিলান্দাতে নিয়ে গেল। হোটেলটা বেশ উন্নতমানের। সেখানেই রাত্রির খাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

পরেরদিন সকাল ৭টা নাগাদ বাসে করে ভেনিস শহরে গেলাম। আস্টারিকা সাগরে ঘেরা দ্বীপ শহর হচ্ছে ভেনিস, ছোট্ট অথচ বেশ সুন্দর দ্বীপ। লঞ্চ করে দ্বীপে গেলাম ওই সমুদ্রে বেশ বড় বড় জাহাজও আছে। ওখানে মিরানো গ্লাস ফাক্টরীতে সকলে গেলাম। সেখানে কাঁচের তৈরি নানারকমের ঘর সাজানো বা দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য নানাধরনের সামগ্রী এবং কাঁচের নানারকমের গহনা তৈরী হচ্ছে। সত্যিই তা অকল্পনীয়। একটা চুল্লি দাউ দাউ করে জ্বলছে। একজন কারিগর সেখান থেকে একটা জলন্ত কাঁচের গোলা বের করে সাঁড়াশী দিয়ে টেনে টেনে পাঁচ মিনিটে একটা সুন্দর ঘোড়া তৈরি করে দেখালেন। সত্যিই অপূর্ব। তবে, জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। এক কাপ কফির দাম ৫.৫০ ইউরো। তখন ১ ইউরো সমান ভারতীয় মুদ্রায় ছিল ৬৮ টাকা। অতএব এক কাপ কফির দাম ভারতীয় মুদ্রায় ৩৭৪ টাকা। আমরা চিন্তাই করতে পারি না। ভেনিস শহর খুবই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর শহর, পুরোপুরি দুষণমুক্ত শহর বলা চলে।

এরপর ফ্লোরেন্সের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। পথে একজায়গায় বিশ্রাম করে দুপুর বেলার খাওয়া সেরে নিয়ে আবার রওনা হলাম। ভেনিস ছাড়ার পথে আস্টারিকা সাগরের উপর দিয়ে যখন চলেছি তখন দূরে বাস থেকে দেখছি আল্পস পর্বতের উপরে বরফ পড়ে সাদা হয়ে আছে মধ্যাহ্নের সূর্যের কিরণচ্ছটায় সমগ্র পাহাড়টা আলোতে ঝলমল করে উঠে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরও যেন বাড়িয়ে দিয়েছে।

ইটালী মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। সেখানে ধান এবং ভুট্টার চাষ খুবই হয়। ভাতই তাদের প্রধান খাদ্য। এখন পর্যন্ত ইটালীতে যত জায়গা ঘুরলাম, দেখে মনে হলো সেখানে পথের ধারে যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করা যায় না। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ছোট্ট একটা দেশ। আমাদের দেশে পরিবেশ দূষণ নিয়ে নেতারা দেশবাসীকে সচেতন ক'রে থাকেন। অথচ সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণকালে লক্ষ্য করলাম শব্দ দূষণ বলেও কোনও বস্তু নাই। যেমন বাস, মোটর সাইকেল, সাইকেল, প্রাইভেট গাড়ী প্রভৃতি ঝড়ের বেগে যাতায়াত করছে অথচ হর্ন বা বেল কেউ বাজাচ্ছে না। কোথাও কোনও ট্রাফিক পুলিশ নাই। সবই অটোমেটিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে মনে হয়।

ফ্লোরেন্স শহর আল্পস পর্বতের পাদদেশে একটি প্রাচীন সুন্দর শহর। ভেনিস থেকে ফ্লোরেন্স শহর প্রায় তিনশো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আমরা সন্ধ্যে ৭টায় ফ্লোরেন্স পৌঁছিয়ে সেস্ট ম্যারিনা গীর্জা, ডেভিড স্ট্যাচু স্পষ্ট ঘুরে ঘুরে দেখলাম। আর্না নদীর

দু'পারেই শহর। মধ্যে মধ্যে নদীতে পাকা সেতু করা আছে যাতায়াতের জন্য। তারপর আমরা Demi Doff Hotel এ চলে এলাম। হাতমুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি রাত্রির আহার করে যে যার ঘরে শুয়ে পড়লাম।

৫ অক্টোবর সকাল আটটায় আবার সেই বাসে রওনা রোম শহরের উদ্দেশে। সত্যি বলতে কি সেই পুরানো প্রবাদের কথা মনে পড়ে গেল "Rome was not built in a day"। অতি সুন্দর নগরী, প্রাচীন শহর, কিন্তু অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। স্থাপত্য শিল্পে সমৃদ্ধ শহর রোম থেকে ভ্যাটিক্যান সিটিতে গেলাম। ভ্যাটিক্যান গীর্জা বিশ্বের বৃহত্তম রোমান ক্যাথলিক গীর্জা। গীর্জার চারদিকে ছাদের প্রাচীরে এক হাজার (১০০৮) আটটি সুন্দর সব স্ট্যাচু দশ থেকে বারো ফিট দূরত্বে বসান আছে। আর গীর্জার সামনের চাতালে হাজার হাজার পায়রা দর্শনার্থীদের পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারুর হাতে কারুর ঘাড়ে বা মাথায় এসে বসছে যেন সকলেরই পোষা। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। গীর্জার বাইরে এবং ভিতরের অভূতপূর্ব স্থাপত্য কারুকার্যে মণ্ডিত শিল্পকলা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। চাতালের সামনের প্রাসাদের দোতালার যে ঘরটিতে রোমান ক্যাথলিক প্রধান ধর্মগুরু দ্বিতীয় পল থাকেন সেই ঘরটি নীচের থেকে দেখলাম। শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে রাত্রে আবার ফিরে এলাম ফ্লোরেন্সের ডেসি ওফ হোটেল।

ফ্লোরেন্স থেকে বাসে পিসা শহরে গেলাম। পিসা শহরটি ছোট। কিন্তু ভারী সুন্দর শহর। এখানে একটি সুন্দর গীর্জা আছে। পিসা শহর ঘুরে দেখার পরে মিলান শহরের দিকে রওনা হলাম। পিসা শহর থেকে মিলান শহর ২০০ কিলোমিটার দূরে। মিলান শহর ইতালীর একটি প্রধান বাণিজ্যিক শহর। মিলান এসি ক্লাব দেখলাম। ইউরোপে একটি নাম করা ক্লাব। এখানকার সংবাদপত্রের খেলার পাতায় মধ্যে মধ্যে আমরা এ সি মিলান ক্লাবের নাম দেখতে পাই। শহরময় কেবল সুন্দর সুন্দর গীর্জা। ইউরোপের ধর্মখ্রীষ্ট, তাই সর্বত্রই কেবল গীর্জাগুলিই দর্শনীয়।

এদিনই দুপুরের দিকে সুইজারল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হলাম। মিলান শহর থেকে সুইজারল্যান্ডের দূরত্ব প্রায় ৩০০ কিলোমিটার। ইতালী এবং সুইজারল্যান্ডের মধ্যে যে বর্ডার তার নাম কোমো। জায়গাটা ভারী সুন্দর। একদিকে সুউচ্চ পাহাড়, তারই পাদদেশে বিশাল লেক। আর পাহাড়ের গায়ে থরে থরে সুদৃশ্য রংবেরংয়ের বাড়ীঘর। পাহাড়ের মাথা সাদা বরফে মণ্ডিত হয়ে আছে। সন্ধ্যেবেলার অস্তমিত সূর্যের অস্তরাগে তার সৌন্দর্য যেন সহস্রগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

বর্ডারে পাশপোর্ট ভিসা না দেখেই পরিদর্শক কর্মীরা আমাদের গাড়ীকে ছেড়ে দিল। আমরা প্রায় রাত্রি ৭-৪০ মিনিটে Hotel Terroce Engelberg-এ উঠলাম। হাত মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ঠাণ্ডা খুবই কম। শীত যে এত কম হবে— কল্পনাই করতে পারিনি। সুইজারল্যান্ডে কনকনে ঠাণ্ডা হবে এটাই আমাদের স্বাভাবিক ধারণা ছিল।

আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, হাইদেলবার্গ।

আজও সকালে জলখাবার খেয়ে সুইজারল্যান্ড ঘুরতে বেড়ালাম। সত্যিই সুইজারল্যান্ড ভগবানের অদ্ভুত সৃষ্টি। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। পাহাড়ের গায়ে গাছগুলোর রংয়ের যে বৈচিত্র ফুটে উঠেছে— সেটা একমাত্র শিল্পীর তুলিতেই সম্ভব। আমরা সকলেই হেঁটে হেঁটে দেখে চলেছি। দেখার আর শেষ নাই। অবশেষে ক্লান্ত শরীরে হোটেলে ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরেই বিশ্রাম। বিকেলেও ঘরেই কাটালাম গল্পগুজব করে। হোটেলে থাকার ব্যবস্থা অতি সুন্দর। খাওয়াদাওয়া খুবই ভালো।

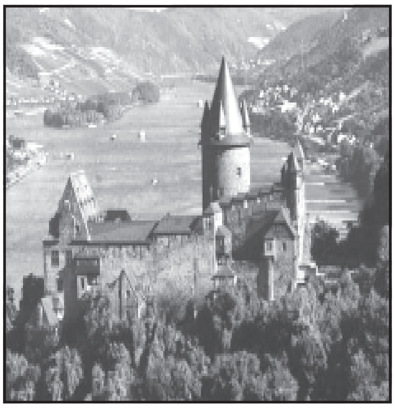

রাইন নদী

গতকালের মতো আজও সকালে Hotel Terrace থেকে হাইদেলবার্গের (Hydel Berg) উদ্দেশে রওনা হলাম। পথে জেনেভা এবং জুরিখ সিটি পড়লো। জুরিখে WHO (World Health Organisation)-এর প্রধান ভবন দেখলাম। সুইজারল্যান্ড এবং জার্মান দেশের Border হচ্ছে রাইন নদী। রাইন নদী পার হয়ে জার্মান দেশে প্রবেশ করলাম। বর্তমানে জার্মান দেশকে বলা হয় (Federal Republic of Germany) এখানে Black Forest, Titisi Lake, Rine Falls (এখান থেকেই রাইন নদীর উৎপত্তি) প্রভৃতি দেখার মতো। কৃষিকার্যে এরা খুবই যত্নবান। জমিতে দেখলাম জৈব সারের প্রয়োগ) সমগ্র ইউরোপেই দেখলাম চাষীরা জৈবসার ব্যবহার করে।

বিকেলে Hydel Berg এ পৌঁছালাম। সেখানে আমরা International University এবং পৃথিবী বিখ্যাত Printing Technology Institute দেখলাম। Hydel Berg (হাইদেল বার্গ) শহর বিকার নদীর তীরে অবস্থিত। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে এই শহরের কোনও ক্ষতি হয়নি বলেই এই শহরটিকে Jentall City of Nicara River বলা হয়ে থাকে।

৯ অক্টোবর। আজ সকালে সেই একই বাসে চড়ে ব্রুসেলস্ রওনা হলাম। Banara থেকে Saint Gove গেলাম। সেখান থেকে কোলন শহরে গেলাম। কোলন জর্মানীর একটা প্রাচীন শহর। কোলন শহরের মধ্যবর্তী স্থানে একটি অতি প্রাচীন গীর্জা দেখলাম। কোলন শহরের রেলওয়ে স্টেশন দেখার পরে জার্মানী সফর শেষ করে আমরা বেলজিয়ামের উদ্দেশে রওনা হলাম। পথে জার্মানী এবং নেদারল্যান্ডের বর্ডার দেখলাম। সন্ধ্যে ৭-৩০টার সময় ব্রাসেলস্ পৌঁছালাম। ব্রাসেলস হচ্ছে বেলজিয়ামের রাজধানী। সত্যিই অতি সুন্দর একটি শহর। এখনও পর্যন্ত যত শহর দেখেছি তারমধ্যে ব্রাসেলস আমার দৃষ্টিতে সব থেকে ভাল মনে হয়েছে। সেইন নদীর তীরে ব্রাসেলস শহর অবস্থিত।

পরদিন সকালে বেরিয়ে আমরা Grand Place গেলাম। সত্যিই Grand Place Grand in every respect. সর্বত্র ঘুরে ঘুরে আমরা দেখলাম। ব্রাসেলসের Indian Resturant এ দুপুরের আহার করলাম। রান্নাও একেবারে ভারতীয় রান্না এবং বেশ ভালো।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সতীর স্থানে কলকাতার প্রথম সর্বজনীন দুর্গোৎসব

নির্মল কর

কলকাতায় দুর্গাপুজোকে পারিবারিক গণ্ডির বাইরে নিয়ে আসার প্রথম কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন 'ভবানীপুর সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভা' নামে একটি ধর্মীয় সংগঠন। বিশ শতকের গোড়ায় ভবানীপুরের পশ্চিম সীমানায় আদিগঙ্গার ধারে বলরাম বসু ঘাট রোডের ক'জন ধর্মানুরাগী এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এর প্রতিষ্ঠাতা। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল সনাতন হিন্দুধর্মের প্রচার, প্রসার এবং সর্বশ্রেণির মানুষের মধ্যে ধর্মভাব জাগিয়ে তোলা।

আদিতে এই বলরাম বসু ঘাট ছিল মুখুজ্জে ঘাট। বঙ্গীয় ১২১৭ অব্দে মুখুজ্জেদের কাছ থেকে দুর্দশাগ্রস্ত ঘাটটি কিনে নেন সেকালের সম্পন্ন ও খ্যাতিমান পুরুষ বলরাম বসু। সেটাকে সংস্কার করে ওখানে প্রতিষ্ঠা করলেন জোড়া শিবমন্দির এবং জগন্নাথ মন্দির। এভাবে ওই মুখোজ্জে ঘাট বলরাম বসু ঘাট নামে পরিচিতি লাভ করে। এককালে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে জলপথে যোগাযোগের অন্যতম ব্যস্ত ঘাট ছিল এটি। আদিগঙ্গার জলপথ ধরে আসা নানা সামগ্রীর এখানে ওঠানামা চলত দিনরাত। বলরাম বসু ঘাটে ছিল একটি শ্মশান। এখানে সতীদাহ হোত। মুখুজ্জেবাড়ির মেয়েরাও এখানে সতী হয়েছেন। ঢাকঢোল পিটিয়ে কাঁসর বাজিয়ে সতীর মাহাত্ম্য প্রচার করতে করতে প্রয়াত স্বামীদের সঙ্গে দাহ করা হোত মেয়েদের। ১৯৭১ সালে এই ঘাট থেকে 'সতীর স্থান' নামে যে ফলকটি উদ্ধার করে ভারতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত হয়, তা থেকে জানা যায়, সতী দেবী ও দেবী দেবী নামে মুখুজ্জে পরিবারের দুই মহিলাকে ১৮২৯ সালে স্বামীদের সঙ্গে এখানেই দাহ করা হয়েছিল। এখানে অন্তর্জলিযাত্রার জন্য ছোট দু'খানা ঘরও তৈরি করা হয়।

সেই বিচিত্র অধ্যায়কে মুছে ফেলে ইতিহাসের পাতায় ফের নাম লেখালেন বলরাম বসু। ঘাটের সামনে ক্ষীণরেখার আদিগঙ্গার চিহ্নমাত্র চোখে পড়ে। জোয়ারের কালে সতীর স্মৃতিবাহী স্থানটি জলে ডুবে যায়। অন্তর্জলিযাত্রার ঘরগুলির সামনেও জল উঠে আসে। পুরনো কলকাতাটা যেন ওখানেই বিস্মৃতির শিকার হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে।

এই সতীর ঘাটেই 'ভবানীপুর সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভা' ১৯১০ সালে কলকাতার প্রথম বারোয়ারি দুর্গোৎসব শুরু করে। আদিতে দুর্গাপুজো প্রধানত বিত্তবান পরিবারে সীমাবদ্ধ ছিল। যদিও বাংলায় বারোয়ারি পুজোর জন্ম ১৭৯০ সালে— হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ায়। বারোজন ইয়ার বা বন্ধু একসঙ্গে এই পুজো করেছিলেন বলে 'বারোয়ারি' কথাটার সূত্রপাত।

২০০৯-এ শতবর্ষ পদার্পণে সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভার দুর্গাপূজা।

সনাতন ধর্মোৎসাহিনীর পুজো এখন আর প্যান্ডেল বেঁধে হয় না, জোড়া শিবমন্দিরের মাঝে শান-বাঁধানো চাতালের যেখানে প্রথম দুর্গাপুজোর সূচনা, পরবর্তীকালে সেখানে একটি পাকা দালান তৈরি করা হয়েছে। ওখানেই শতাব্দী-প্রাচীন দুর্গোৎসবটি সমারোহে সম্পন্ন হয়।

সূচনায় যে-পুজো উদ্যোক্তাদের অর্থে আয়োজিত হোত, এখন তা সর্বজনীন পুজোয় রূপান্তরিত হয়েছে। ধর্মোৎসাহিনী সভাই কলকাতার প্রথম সর্বজনীন পুজোকমিটি। এটি একটি রেজিস্টার্ড সংস্থা। এঁদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা দেড় শতাধিক। সতীর স্থানের এই সর্বজনীন পুজোর প্রতিমায় দিনে দিনে অভিনবত্ব আনা হলেও পুজোর আচার-অনুষ্ঠান আধুনিকতার স্রোতে ভেসে যায়নি। সনাতন ধাঁচের সহজ মৃন্ময়ী-মূর্তিতে কোনও বিচ্যুতি ঘটাননি উদ্যোক্তারা, সম্পূর্ণ সাবেকিরীতিই বজায় রাখা হয়েছে। বৈদিক নিয়ম মেনে শুদ্ধাচারে একচালা বাংলা প্রাচীন-রীতির প্রতিমা-পুজোই ভবানীপুর ধর্মোৎসাহিনী সভার প্রধান লক্ষ্য।

চালচিত্রের নয়নাভিরাম নকশায় শোলার কারুকাজে ফুটে ওঠে সাবেক মহিষাসুরমর্দিনীর রূপ। প্রতিমার বিশেষত্ব মাটির দুর্গায় সোনার ত্রিনয়ন। ১৯৯৩ সালে মুখুজ্জেবাড়ির এক সদস্য এটি দান করেছিলেন। দেবীকে সাজানো হয় সোনার হার, বালা, চুড়িসহ নানা মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কারে। ভক্তদের দেওয়া মায়ের অলঙ্কারের তালিকায় যেসব সামগ্রী নথিভুক্ত করা হয়েছে, করা হয়েছে, তার মধ্যে আছে সোনার আসন, সোনার আংটি, সোনার বেলপাতা এবং সোনার নথ মিলিয়ে মোট ১১,৬৫০ গ্রাম সোনা আর রুপোর তৈজসপত্রের পরিমাণ ৫,৯১,০০০ গ্রাম। ফি-বছর আজও অনেকে দুর্গার জন্য সোনা-রুপোর গয়না দান করেন। কলকাতায় আর কোনও সর্বজনীন পুজোয় মায়ের নামে এত ধন-সম্পত্তি জমা পড়ে না। পুজোর চারদিনে প্রচুর শাড়িও জমা পড়ে।

আলোর রোশনাই এবং সানাইয়ের সুরে সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভার সর্বজনীন দুর্গোৎসব ১০১ বছরের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। চারজন পুরোহিত পুজোর চারদিন আলাদা আলাদা দায়িত্বে থাকেন। প্রধান পুরোহিত মায়ের পূজাধ্যানে ব্যাপৃত থাকেন তো দ্বিতীয়জন মণ্ডপ সংলগ্ন ষষ্ঠীতলায় পূজায় নিরত। তৃতীয় পুরোহিত চণ্ডীপাঠ করেন। চতুর্থজন তন্ত্রধারক।

মহাষষ্ঠীর দিন দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাসের পর দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকামতে নবমীর দিন ন'বছরের এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে কুমারীরূপে পুজো করা হয়। পুজোর বিভিন্ন দিনে নিরামিষ ভোগে দেবীর আপ্যায়ন। সেই প্রসাদ পান অঞ্চলের অধিবাসীরা। দশমীর দিন কুলাচার অনুসারে বিসর্জনান্তে সাদা অপরাজিতার ডালে লাল কার বেঁধে অপরাজিতা পুজো। অপরাহ্নে দেবীর সঙ্গে এয়োদের সিঁদুর খেলা। তারপর স্থানীয় এলাকায় প্রতিমা পরিক্রমা করে সতীর ঘাটেই প্রতিমা নিরঞ্জন। কিন্তু বিসর্জন হয় না দেবীর সোনার ত্রিনয়ন।

বনেদী বাড়ির পুজোয় বাড়ির মহিলারা

বিদিশা ভট্টাচার্য

"যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী যা মহিষোন্মূলিনী যা ধূম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী, শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভ দৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রী পরা সা দেবী নবকোটীমূর্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী।"

—শ্রীশ্রী চণ্ডী, চণ্ডিকার ধ্যান (৩)

পেঁজা তুলোর মেঘের আনাগোনা শিউলিফুল, শিশিরভেজা ঘাস, ঢাকের ড্রিমি ড্রিমি শব্দ! আর সন্ধিপুজোর সময় ঢাকের বোলের একটা সুমধুর ধ্বনি মনে করিয়ে দেয় মা দুর্গার আগমনবার্তা। বিল্ববৃক্ষে দেবীর বোধন, কল্পারম্ভ, সন্ধিপূজা...দুর্গাপুজোর প্রতিটি পরতে মিশে রয়েছে কিংবদন্তি, খানিকটা ইতিহাস আর অবশ্যই পুরাণের কল্পনা। এসবের মধ্যে কিঞ্চিৎ ঘোরাঘুরি করা মানেই চেনা আর প্রিয় উৎসব দুর্গাপুজোকে আর একটু কাছ থেকে দেখা এবং চেনাও।

পুজো মানেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে পুজোর সাজ। কবিগুরুর ভাষায়— আশ্বিনের সেই প্রকৃতির সৌন্দর্য, রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণের শোভা মানবহৃদয়-কে সুসজ্জিত করে তোলে। আর সাজ-সজ্জা মানেই রয়ে গেছে সাবেকিয়ানা। আর নারীদের মধ্যে নিজেকে সুন্দর করে গড়ে তোলার প্রবণতা চিরকালের। আমরা যদি ইতিহাসের পাতা হাতড়াই তাহলে দেখতে পাব বেশ কিছু বনেদি বাড়িতে নারীদের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। কথিত আছে, যে 'চুল বাঁধে সে রাঁধে', তাই দুর্গাপুজোর সাজের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের ভূমিকাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই।

ভাণ্ডারহাটির চৌধুরীবাড়ি : বনেদী বাড়ির ঐতিহ্যভরা ৫০০ বছরের প্রাচীন দেবীপূজা, এখানে মা দশভূজা নন। এই বাড়ির পুজোয় পরিবারের মহিলাদের একটা বড় ভূমিকা আছে। অষ্টমীর সন্ধিপূজায় বলিদানের পর একটা সুন্দর প্রথা এই পরিবারে পালিত হয়। অষ্টমীর পালাদারদের বাড়ির মহিলারা মাথায় প্রদীপ বা মালসা নিয়ে কিছু কাঠি জ্বেলে, হাতে প্রদীপ নেন এবং সর্বোপরি সুসাজে সজ্জিতা দেবীরূপে আটচালায় এসে বসেন। পরনে লালপেড়ে শাড়ী, মাথায় সিঁদুর রাঙা কুমকুম, বিবিধ অলংকারে পরিবৃতা। পরিবারের ছোট ছোট বাচ্চারা তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেয়। এই পরিবারের বৈশিষ্ট্য নবমীর দিন মহিলারা সিঁদুর খেলেন। ঐতিহ্য ও মিলনে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আসছে এই পুজো।

শোভাবাজার রাজবাড়ী : উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট পূজার মধ্যে একটি। এই পুজোর মূল বৈশিষ্ট্য ছিল— শুধু ভারতীয়রা নয়, বিভিন্ন বিদেশী মেমরাও তাদের রুচিসম্মত সাজে নিজেরা যোগদান করতেন, অন্যদিকে দেশের সেরা বাইজিদের নৃত্যের ছন্দ তো ছিলই। বর্তমানে অবশ্য এই প্রথা নেই। ১৭৫৭ সালে শুরু হয় এই পূজা। আজ নেই হয়তো সেই রমরমা, কিন্তু তা সত্ত্বেও আছে নিষ্ঠা, আছে ঐতিহ্য মেনে চলা। এই বাড়ীর পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মহিলারাও সমানভাবে নিজেদেরকে কর্মে নিযুক্ত রাখেন। বাড়িতে; ভিয়েন ঘরে মিঠাই ভোগ তৈরিতে, আবার ১০৮টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করতে, শুধু তাই নয়, প্রতিমা নিরঞ্জনে পর্যন্ত তাঁদের ভূমিকা অতুলনীয়। তাঁদের বেশভূষায় রয়েছে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া, গরদের শাড়ী, পুরোনো নকশায় স্বর্ণালঙ্কার এখনও দেখা যায়। ঐতিহ্যের মিশেলে এই বাড়ির পুজো এখনও তাই অন্যরকম আকর্ষণের।

পাথুরিয়াঘাটায় ঘোষবাড়ী : ১৮৯১ সালে পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের খেলাত ঘোষের বাড়ির পূজা কলকাতার অন্যতম প্রাচীন বনেদি বাড়ীর পুজো। এখানকার প্রতিমা তিনচালার। নবমীতে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী ভোগের আয়োজন করা হয়। আর সেখানে মূলত, মহিলারা কোমর বেঁধে হাত লাগান। তাছাড়া অতীতে এখানে যাত্রা বা থিয়েটার বসত সেখানে নারীরা অংশগ্রহণ করতেন। কখনও পুরুষবেশেও তাঁরা মঞ্চে আবির্ভূতা হতেন। তবে বর্তমানে তরজা গানের অনুষ্ঠানই চালু আছে। বনেদিবাড়ির ঐতিহ্যের সঙ্গেও যেন মানানসই হয়ে যায় এই জমাটি আসর।

দক্ষিণ কলকাতার দুর্গাবাড়ী : বর্তমানে এটি খুব পরিচিত হয়ে উঠেছে কলকাতাবাসীর কাছে। এখানে নারীরা নিজের হাতে পরিবেশন করে ভক্তদের প্রসাদ খাওয়ান এবং পুজোর কাজ, ধুনুচী নাচ, নবমীর দিন নাটক, গান-নাচ আসর মাতিয়ে রাখেন। এই আনন্দের মুহূর্তে পরতে পরতে মা দুর্গার উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

অর্থাৎ নারীদের ভূমিকা ছোট-বড় নানাভাবে যেকোনও অনুষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর হবে নাই বা কেন? শুভশক্তিরূপিণী মা দুর্গার যে আশিস রয়েছে নারী জাতির উপর। তাঁরা তাঁদের শক্তি ও রূপের ছটায় জগতে আজ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখছেন। প্রত্যেকটি বনেদী বাড়িতেই লক্ষ্যণীয় যে কম-বেশী ভাবে নারীদের পূজার সাজের বর্ণনা। প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। বর্তমানে মা দুর্গাও যেমন নানারকম সাজে আবির্ভূতা হন কখনও রণরঙ্গিনী, কখনও বা মাতৃরূপিণী। তাঁর বস্ত্রে এখনও স্থান পাচ্ছে— কখনও শুকনো পাতা, কখনও নারকেলের ছোবড়া, বাচ্চাদের ক্যান্ডি বা আলপিন ইত্যাদি। পুজোর সাজের একাল সেকাল নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই উঠে আসে নানা রকমের অভিমত।

'সাজ'-এর আন্তরিক অর্থ বোধহয় অনেকটাই পাল্টে যাচ্ছে আধুনিক নারীদের কাছে। তারা এখন আর লজ্জাপটা নন, তাদের মধ্যে পাশ্চাত্যের ছোঁয়া লেগেছে অনেকটাই। এখনও হারিয়ে গেছে পুজোর দিনে সেই ঢাকাই শাড়ী, নেই আর ধনেখালি, তাঁত ইত্যাদি। এসব ছেড়ে নারীরা এখন জিন্স, টপ, লেগিন্স, কুর্তায় বেশি স্বচ্ছন্দ। তাদের রুচিবোধেও এসেছে নানা পরিবর্তন।

তবুও কিছু নারীকে এখনও গ্রাস করতে পারেনি পাশ্চাত্যের ভাবধারা, তাঁরা এখনও শাড়ীকে মুখ্য সাজের অঙ্গ হিসেবে মেনে নেন। শুধু শাড়ী নয়, বাঙালীয়ানার আভিজাত্যকে তাঁরা সর্বদা মেনে চলেন।

সত্যিই সেই নারী হয়ে ওঠে অনন্যা। তাই বোধহয় আজও পুজোর অষ্টমীর সকালে অঞ্জলির সময় মা-দিদিমার সেই আটপৌরে শাড়ীকেই বেছে নেওয়া হয়। নারীর হৃদয়ে বোধহয় পুরোপুরি আধুনিকতার কৃত্রিম মায়াজাল প্রভাব ফেলতে পারেনি। কিছুটা এখনও অতীতের সৌন্দর্য তাঁদেরকে আবৃত করে রেখেছে। আর দুর্গা-পুজো হলো সেই আদর্শ সময়। হয়তো সেই রামও নেই, নেই সেই অযোধ্যাও, কিন্তু বাঙালীর বনেদি দুর্গাপুজো আছে। আগেকার সেই আড়ম্বরে না হোক, আছে ঐতিহ্যে, পরম্পরায়। আর নেই বেশিদিন, মা আসছেন গজে মর্ত্যবাসী মত্ত তাই সাজে। শুধু একটি কথাই বলা যায় যে ঢেউ ছাড়া যেমন সমুদ্র, মেঘ ছাড়া আকাশ তেমনই সাজ ছাড়া নারী অর্থহীন।

আনন্দের এই উৎসব-ছুঁয়ে যাক সকলের জীবন এই কামনাই সকলের সঙ্গে।

সমাবেশ সমাচার

সিউড়ীতে সংস্কার ভারতীর কবিপ্রণাম

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মসার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সংস্কার ভারতী সিউড়ী শাখার উদ্যোগে গত ২৮ আগস্ট সিউড়ী রবীন্দ্র সদনে 'কবিপ্রণাম' ও সংস্কার ভারতীর রজত জয়ন্তী বৎসর উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান হয়। সর্বভারতীয় প্রথা মেনে নৃত্য সহযোগে ভাবসঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। পরে কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক আমীরচাঁদজী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মকথা, কবিতা, গান ও নাটকের অংশ নিয়ে এক অনবদ্য কোলাজ 'নহি সামান্যা নারী' দর্শকদের মুগ্ধ করে। নৃত্য পরিচালনায় মৌমিতা বিষ্ণু। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনায় তিলক সেনগুপ্ত। সংস্কার ভারতীর কবিপ্রণাম উৎসবে মোট ৮৬ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করে। নৃত্য অনুষ্ঠানে প্রজেক্টার মেশিনের সাহায্যে বড় পর্দায় কোলাজ ছবির ব্যবহার বীরভূমে এই প্রথম ও ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা।

জন্মাষ্টমী উৎসব

বলাগড়

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হুগলী জেলার বলাগড় প্রখণ্ড প্রতি বৎসরের মতো এবারেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব উদযাপন করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতিসহ হরিনাম সংকীর্তন সহযোগে এক বিরাট বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে অরসাশ্রম প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সেখানে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ সোমনাথ মহারাজ। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রীমৎ স্বামী তিতিক্ষানন্দ মহারাজ। সভায় উপস্থিত সন্ত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাল্যদান করেন সেবা প্রমুখ কুবের প্রসাদ জয়সোয়াল। মঙ্গলাচরণ ও গীতা পাঠ করেন আচার্য কমলাকান্ত। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাসুদেব ঘোষ এবং স্বস্তিকা পত্রিকার ব্যবস্থাপক অভিজিৎ রায়চৌধুরী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনদর্শন ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে আকর্ষণীয় ছিল কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অমিতাভ দত্ত এবং সুশীল ভট্টাচার্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ননীগোপাল দাস।

কসবা

গত ২২ আগস্ট জন্মাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে সংস্কার ভারতীর কসবা শাখা, কসবায় প্রতিষ্ঠিত আদ্যাকালীমাতার মন্দিরে 'কৃষ্ণ-সজ্জা প্রদর্শন'-এর আয়োজন করে। সেইসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বৃত্তান্ত আলেখ্য সহযোগে সঙ্গীত পরিবেশন করে। সংগঠনের পূর্বাঞ্চল প্রমুখ বিকাশ ভট্টাচার্য কৃষ্ণসজ্জা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী সকল শিশুর হাতে অভিজ্ঞানপত্র তুলে দেন।

গাজোল

গত ২২ আগস্ট মালদহ জেলার গাজোলে সংস্কার ভারতী পালন করল কৃষ্ণ জন্মোৎসব। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের নানা দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন পরেশ চন্দ্র সরকার। সঙ্গীত পরিবেশন করেন জয়া চক্রবর্তী। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন

সিউড়ী শাখার কৃষ্ণ সাজো

জন্মাষ্টমী তিথিতে বহুরূপে কৃষ্ণের প্রকাশ ঘটল কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতায়। সংস্কার ভারতী, সিউড়ি শাখার আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বপ্না চক্রবর্তী, তিন বিচারক— নাট্য ব্যক্তিত্ব রজ সাহা, চিত্রকর সারথি দাস, শিক্ষিকা কৃষ্ণা চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় শিশু শিল্পীরা কৃষ্ণের নানা রূপসজ্জা করে মঞ্চে হাজির হয় একে একে। মঞ্চে প্রতিযোগীরা কথায়-গানে, সংস্কৃত শ্লোকে, গীতার বাণী উচ্চারণের মাধ্যমে কৃষ্ণের নানা রূপের প্রকাশ ঘটায়। উল্লেখযোগ্য ভাবে মাখন চোর কৃষ্ণ, গোষ্ঠের গোপাল, নাড়ুগোপাল, বংশীধারী কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ, সুদর্শনধারী কৃষ্ণ, যশোদা নন্দন কৃষ্ণ এমনই নানা রূপে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হয় কৃষ্ণের নব নব রূপ। ২ বছর থেকে ৬ বছরের শিশুদের কৃষ্ণরূপ সজ্জায় অংশ গ্রহণে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন তিলক সেনগুপ্ত। ক্ষুদে কৃষ্ণদের গলায় গীতার শ্লোক ও বাণী শুনে মুগ্ধ আট থেকে আশি।

চঞ্চল প্রসাদ চক্রবর্তী।

কসবায় রাখী বন্ধন উৎসব

গত ১৩ আগস্ট রাখী পূর্ণিমার দিন সংস্কার ভারতীর কসবার 'নবারুণ সঙ্ঘ' ক্লাব ঘরে কসবা শাখার সদস্যরা উপস্থিত থেকে পথচলতি সকল মানুষদের হাতে রাখী পরিয়ে লিফলেট্ বিতরণ করে। কিছু বস্তিবাসী শিশুদেরও সেখানে ডাকা হয়েছিল। সবার হাতে রাখী পরিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়।

জামালপুরে আলু চাষী সম্মেলন

বর্ধমানের জামালপুরে কালাড়াঘাট কোল্ড স্টোরে ২১ আগস্ট প্রায় ৭০০ জন আলু-চাষীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ভারতীয় কৃষাণ সংঘ এবং আলু-চাষী কল্যাণ মঞ্চ দ্বারা আয়োজিত আলুচাষীদের এক সম্মেলন। সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ভারতীয় কৃষাণ সংঘের অজিত কুমার বারিক। জামালপুর আলুচাষী কল্যাণ মঞ্চের সভাপতি অর্ধেন্দুশেখর ঘোষ আলু চাষীদের দুরবস্থার কথা বলেন। ভারতবর্ষে প্রতি বছর প্রায় লক্ষাধিক চাষী আত্মহত্যা করেন।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে চাষীরা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন তার মাশুল দিন দিন বাড়তেই থাকে। সম্প্রতি বিদ্যুৎ দপ্তরের ঘোষণা প্রতি ইউনিটে কমপক্ষে ৮ পয়সা বর্ধিত হারে বিদ্যুৎ মাশুল দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের চাষীরা এখনও শস্যবিমার আওতায় আসতে পারেনি। বা চাষীদের শস্যবিমার আওতায় আনার ব্যবস্থা কোনো রাজনৈতিক নেতা বা দল বা সংগঠন এগিয়ে আসেনি। চাষীদের ফসলের কোনো নায্য দাম ঠিক করা হয়নি। তাই আলুচাষী কল্যাণ মঞ্চের চাষীরা সংগঠিতভাবে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সর্বশেষে আলুচাষী কল্যাণ মঞ্চের পক্ষে বর্ধমান জেলার সভাপতি মহাদেব পান ও পশ্চিমবঙ্গের কিষাণ সংঘের প্রাক্তন সভাপতি শম্ভুনাথ নায়েক দাবি জানান— আলুচাষীদের আলুর সঠিক মূল্য প্রদান করা, যাতে আলুচাষীরা অন্ততপক্ষে ৬ টাকা কেজি হিসাবে বাজারে আলু বিক্রয় করতে পারেন।

শোকসংবাদ

গত ১৯ আগস্ট মালদহের রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সদস্যা তথা সংস্কার ভারতীর এক সময়ের সক্রিয় সদস্যা আগমনী লাহিড়ী কিছুদিন রোগ ভোগের পর এলাহাবাদে অকালে পরলোকে গমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর। বর্তমানে তার মা এবং ভাই রয়েছেন। তাঁদের সম্পূর্ণ পরিবারই সঙ্ঘময়।

সোনারপুরে পথসঞ্চলন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতের সুন্দরবন জেলায় আগামী নভেম্বরে আগমন উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন মহকুমায় পথসঞ্চলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই সূত্রে গত ৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে সোনারপুর মহকুমায় পথসঞ্চলনের এক কার্যক্রম হয়। স্পোর্টিং ইউনিয়নের মাঠের ভিতর থেকে অরবিন্দ নগর ও রূপনগর হয়ে গোড়খাড়া স্কুলের সামনের রাস্তা দিয়ে বাজার পরিক্রমা করে কাঠপুলে শেষ হয়। ঘাসিয়াড়ার এক মাঠে সভার মাধ্যমে পথসঞ্চলনের কার্যক্রম শেষ হয়। ১৫০ জন গণবেশধারী স্বয়ংসেবক এই পথসঞ্চলনে অংশগ্রহণ করে।

প্রতিবাদ সভা

গত ২ সেপ্টেম্বর হিন্দুজাগরণ মঞ্চের পরিচালনায় উত্তর ২৪ পরগণার টিটাগড় থানার নিকট ভ্রষ্টাচার, দুর্নীতি ও পি সি টি ভি বিল-এর বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন হিন্দুজাগরণ মঞ্চের দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক দিলীপ ঘোষ, অসিতবরণ আইচ। একইভাবে হালিশহরের চৌমাথা বাজার ও জেঠিয়া বাজারে প্রতিবাদ সভায় বিপুল জনসমাগম হয়। সেখানে অসিত বরণ আইচ বক্তব্য রাখেন।

বোল্ট যেন বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুতগামী

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নিজের ভুলে শতমিটারের খেতাবটি হাতছাড়া হয়েছে। কিন্তু তিনি যে শুধু এই গ্রহেরই নন, গোটা ব্রহ্মাণ্ডের দ্রুততম দু'পেয়ে জীব, তা আরও একবার বিস্ফারিত নেত্রে প্রত্যক্ষ করলেন সাতশো কোটি মানুষ। দক্ষিণ কোরিয়ার দেগুতে সদ্য সমাপ্ত বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে জামাইকার উসেইন বোল্ট যেন হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে ট্রাকের বুকে উড়ে গেলেন। ২০০ মিটারে সময় নিয়েছেন ১৯.৪৭ সেকেন্ড, বিশ্বরেকর্ড সহ। আর ৪×১০০ মিটারে বোল্টের নেতৃত্বে জামাইকা বিশ্বরেকর্ড গড়ে, ৩৭.০৪ সময় নিয়ে। অবিশ্বাস্য টাইমিং, মানুষের গতি, শক্তি কোন পর্যায়ে চলে গেছে, ভাবলেই মাথা ঘুরে যায়।

এবার দক্ষিণ কোরিয়াতে বোল্টের স্বদেশীয় আসাফা পাওয়েল আসেননি। চোট থাকায়, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে নাম তুলে নিয়েছেন আসাফা। আসাফা থাকলে বোল্টের ২০০ মিটার টাইমিং আরও উন্নত হোত ও দলগত রিলের ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন দেখা যেত। কয়েকদশক আগে মানুষের দূরতম কল্পনাতেও স্থান পেত না শত মিটার রেস দশ সেকেন্ডের কমে কোনও স্প্রিন্টার দৌড়তে পারে বলে। আর এখন আসাফা, উসেইনরা এই দূরত্ব অতিক্রম করছে ৯.৬০ সেকেন্ডের আশেপাশে! তারও কম সময়ে অবশ্য এই দুজনেই দৌড়চ্ছেন ইদানিংকালে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ বা অলিম্পিকে এই ৯.৬০ সেকেন্ড সময় নিয়ে স্প্রিন্ট ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। যা দেখে বিস্ময়ে হতবাক ক্রীড়া-বিজ্ঞানীরা।

গত ক'দিন কলকাতা তথা ভারতবাসী মাতোয়ারা ছিল মেসিকে নিয়ে। মেসি নিঃসন্দেহে জিনিয়াস। বিশ্ব ফুটবলে বর্ণময় চরিত্র। তার অতিমাত্রিক স্কিল, গতিশীল ড্রিবলিংকে অকুণ্ঠ সম্মান জানিয়েও বলতে হয় বোল্টের কীর্তির পাশে তা যেন নেহাতই সিন্ধুতে বিন্দুর মতো। মেসি, আর্জেন্টিনা ভেনেজুয়েলা ম্যাচ নিয়ে টন-টন নিউজপ্রিন্ট, ফিতের পর ফিতে নিউজ রিল খরচ করেছে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া। অথচ বোল্টের এই অলৌকিক কীর্তি যেন অনালোচিতই থেকে গেল গণমাধ্যমে। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না বোল্টের। গোটা বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমে এই আন্তর্জাতিক ফুটবলের ভরা মরসুমেও বোল্টই সুপার লিড। তার সঙ্গে তুলনা টানা হচ্ছে রেডিও ইলেকট্রিক পাওয়ারের। বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুতগামী অথচ চিতার দৌড়ের মতো নান্দনিক সুন্দর। এক অনবদ্য কাব্য-সুষমায় মোড়া উসেইন বোল্টের লং স্ট্রাইভ স্প্রিন্ট। যেন বিশ্বের দশম বিস্ময়। পরের বছর লন্ডন অলিম্পিকের ট্রাকে এই বজ্রবিদ্যুতের 'স্পার্ক' দেবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত বিশ্বমানব। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের কথা লোকে ভুলে যাবে, কিন্তু অলিম্পিকের কীর্তি কালজয়ী।

ভারতীয়দের ফল আশাব্যঞ্জক : বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে তরুণ ভারতীয় ব্রিগেড যা ফল করছে, তা নিয়ে হতাশ হবার কিছু নেই, বরঞ্চ কোনও কোনও মাপকাঠিতে তা যথেষ্ট কৃতিত্বের এবং আশাব্যঞ্জক। বিশেষ করে সাম্প্রতিক ডোপ বিতর্কে জেরবার ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স যখন পাতালগহ্বর থেকে উঠে আসার জন্য দেগুকেই উত্থানমঞ্চ ধরে যাবতীয় লক্ষ্যের একমাত্রিক সমীকরণ করেছিল। সুন্দরী ময়ুখা জনি লংজাম্পের ফাইনালে উঠেছেন। সুপরিচিত বিকাশ গৌড়া ডিসকাসে নিজের রেকর্ডকে উন্নত করে ফাইনালে উঠে তার চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ ও জোরদার প্রতিদ্বন্দ্বীদের চাপে রাখতে পেরেছেন। ময়ুখা বিকাশ দুজনেই আগামীদিনে আরও বড় সাফল্য এনে দেবেন। ময়ুখা বর্তমানে এশিয়া চ্যাম্পিয়ন। বিকাশ কমনওয়েলথ গেমস সোনা জয়ী, এশিয়াডে অল্পের জন্য সোনা জিততে ব্যর্থ হয়েছেন। কীর্তিখ্যাত পিটি উষার ছাত্রী টিন্টু লুকা ইউরোপীয়ান সার্কিটে নজরকাড়া পারফরমেন্স করে দেগুতে এসেছিলেন। ফাইনালে ওঠা তাঁর কাছে অসম্ভব ছিল না। কাফ মাসেলে খানিকটা টান ধরায় নিজের স্বাভাবিক গতি তুলতে পারেননি শেষ ল্যাপে। তবে তাঁর যা প্রতিভা তাতে অচিরেই তিনি বিশ্ব মঞ্চে নিজের জাত চেনাবেন। তা শুধু সময়ের অপেক্ষা। তবে ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটি ডোপ কেলেঙ্কারিতে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ভারতের ৪×৪০০ মিটার মহিলা রিলে দল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, বেজিং অলিম্পিকসহ সর্বত্রই অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এশিয়াড, কমনওয়েলথ গেমসে তাদের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। বিশ্বপর্যায়ে হেভিওয়েট সব দেশের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে দৌড়ে আসছেন। সেই দলের দু'জন ডোপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে ভারতের লন্ডন অলিম্পিকের প্রস্তুতি ও সাফল্যের দিক্‌চিহ্নকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে ফেলে দিয়েছেন।

শব্দরূপ-৫৯৭ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

■	■	১			২	■	৩
৪	৫		■	■		■	
■		■	৬	■	৭	৮	
■	৯			■	■		
■		■	■	১০			
১১		১২	■		■		
	■		■	■	১৩		
	■	১৪				■	

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. রাজা রাজবল্লভের কীর্তি-ধ্বংসকারিণী পদ্মা নদী, ৪. আপত্তি, মিথ্যা অজুহাত, ৭. বর্ষাকালে গেয় একপ্রকার সংগীত, ৯. বাহ্য আড়ম্বর, **১০.** পুরাণোক্ত সমুদ্র যাহাতে বিষ্ণু অনন্তশয্যায় থাকেন, **১১.** কৃষ্ণকর্তৃক নিহত দানবী বিশেষ, **১৩.** ব্যাধ, **১৪.** আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ (বিবাহাদির শুভকর্মের পূর্বকৃত্য)।

উপর-নীচ : ১. শুকপাখি, **২.** শালিক পাখি, **৩.** মারাঠা দস্যু, **৫.** পৌরাণিক রাজর্ষি বিশেষ, ব্যঙ্গে অকর্মণ্য, নিষ্ক্রিয়, **৬.** যাহার বেশ বা রূপ হাস্যজনক, **৮.** মূল অর্থ জরাগ্রস্ত বৃষ, লক্ষার্থে বৃদ্ধ, অথর্ব, **১০.** রোগা, শীর্ণ, **১১.** পূর্বদিক, **১২.** যে সজিনা গাছে বারোমাস ফুলফল হয়, **১৩.** সাধ, অভিরুচি, পছন্দ।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৯৫
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

■	কৃ	■	হা	■	জ	রি	প
■	প	স্ব	ল	■	ল		র
অ	■	■	খা	ল	সা		ম
সি	দ্ধি	দা	তা	■	■		হ
প	■	■	■	কা	লি	ম্প	ং
ত্র	■	অ	ঢে	ল	■		স
ব্র	■	ক্রূ	■	নে	হা	ই	
ত	স্ক	র	■	মি	■	তু	

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৯৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৪ অক্টোবর, ২০১১ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। সর্প যজ্ঞ।। ২২

মোটরবাইক তুমি কার? গতি'র, না দুর্গতির?

রমাপ্রসাদ দত্ত

ছেলেদের মোটর সাইকেল কেনায় সায় ছিল না শিশির করের। প্রত্যেকে সাবালক। চাকরি-বাকরি পেয়ে বিয়ে-থা করেছে। ছেলেপিলের বাবা হয়েছে। একই চত্বরে আলাদা আলাদা সংসার চার ছেলের। অনেক বছর আগে শিশির বিপত্নীক। মা-হারা ছেলেদের খুব কড়া শাসনে মানুষ না করলেও ছেলেরা লেখাপড়া শিখে ভালো কাজকর্ম পেয়েছে। সব ব্যাপারে বাবার মতামত নেওয়ার প্রয়োজন হয় না তাদের। তবে বাড়িতে মোটর বাইক ঢুকছে দেখে কিছু না বলে থাকতে পারেননি শিশির। ছোট ছেলে প্রথমে কেনে। সে একটু গোঁয়ার গোবিন্দ ধরনের। নিজে যা ভালো বোঝে করে। কারও পরামর্শ তোয়াক্কা করে না। ছমাসের মধ্যে আরও তিন ছেলে কিনল মোটর সাইকেল। ছোট ছেলে কিনে ফেলল আরেকটা। বড় ছেলে দূরের স্কুলে পড়ায়। ট্রেনে যাতায়াত করে। সে বলল, 'আমি মোটর বাইক কিনবো না। তবে চড়তে আপত্তি নেই। চালাবো না, দরকার হলে পিছনের সিটে বসবো।' মফস্বল স্টেশন-লাগোয়া বাড়ি। চারটে মোটর বাইক অনেকটা জায়গা নিল। সেগুলো যত্নের জন্যে অনেকটা সময় দিল তিন ভাই। লাইসেন্স পেয়েছিল আগেই। ক্রাশ প্রুফ হেলমেট কেনার সময়েই নিয়েছিল। কিন্তু সেসব কখনও ব্যবহার হয়নি। ধুলো জমেছে। বাড়ির বউরা ছেলেমেয়েরা বাইকে চড়েছে। শুধু শিশির কোনওদিনও চড়েননি। বাড়ির কাছেই ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক। প্রায়ই খবর পান দুর্ঘটনার। চোখে না দেখলেও বিবরণ শুনে বুক ধড়ফড় করে। ছেলেদের বারণ করতেও শুনল না। শ্রীদুর্গা মিষ্টির দোকানের মালিকের মেজ ছেলেটা গত বছর বউকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল, ট্রাকের ধাক্কায় দুজনেই মারা গেছে। অধীর ডাক্তার তো খোঁড়া হয়ে গেছে ভালোমতো চোট খেয়ে। অধীরই বলেছিল, 'শিশিরদা দু'চাকাকে কোনও বিশ্বাস নেই। ছেলেরা কিনল ঠিকই, দেখবেন সবাই প্রতিদিন ঠিকমতো ঘরে না ফেরা পর্যন্ত স্বস্তি পাবেন না।'

দুর্গা পুজোর কদিন আগে বৈঠকখানায় বসে কথা বলছিলেন শিশির পাড়ার অমূল্য রায়ের সঙ্গে। নানা প্রসঙ্গ আসছিল। ছেলেরা সকলে না ফেরা পর্যন্ত বৈঠকখানা ছেড়ে ভিতরে যান না। মেজ ছেলে তরুণের ফিরতে দেরি দেখে চিন্তা হচ্ছিল তাঁর। শিশির সন্ধের পর রাতের খাওয়া সেরে নেন বলে চিন্তা ছিল না খাওয়ার ব্যাপারে। বৈঠকখানার বাইরে এসে একবার দেখলেন, ছোটাছুটি করছে বাড়ির অনেকে। পাড়ার কয়েকজনও আছে। তরুণের ঘরের সামনে ভিড়। তাঁকে কেউ কিছু বলছে না। বুঝতে পারলেন একটা বিপদ-আপদ ঘটেছে। নাতনি বুড়ুকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন। 'কি হয়েছে রে?' বুড়ুকে কেউ কিছু শিখিয়ে না দেওয়ায় সে বলেছে দাদুকে, 'বড়কাকার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।' তিনি যাতে জানতে না পারেন সে চেষ্টা চলছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাত বছরের নাতনির মুখে শুনলেন। বৃদ্ধবয়সে পুত্রশোক সামলানো কঠিন। পাড়ার অনেকে এসেছেন। শিশির একটা কথাই বার বার বলতে লাগলেন, 'আমি বারণ করেছিলাম। ওই ভয়ঙ্কর গাড়ি কিনিস না। যে কোনও সময় বিপদ ঘটতে পারে। হলোও তো। কেউ আমার কথা শুনল না। স্বাধীন ছেলেপিলে, বাপের কষ্ট তোরা কি বুঝবি!'

বর্ধমানের এক গ্রামে বিয়েবাড়ি উপলক্ষে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যের পর দেখি বাড়ির সামনে সারবন্দী মোটরবাইক। মনে হচ্ছিল কোনও শো-রুম। গুনেছিলাম ১৩২টা মোটর বাইক বিভিন্ন মডেলের। যাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তাঁরা মোটর সাইকেলে এসেছেন। প্রতি বাইকে গড়ে দুজন করে। কোনও কোনও পরিবারের একাধিক মোটর বাইক এসেছিল। ওইরকম ছবি দেখা যাবে মফস্বলের অধিকাংশ বাড়িতে নানান অনুষ্ঠানে। গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেছে দুটো জিনিস— সেল ফোন বা মোবাইল আর মোটর বাইক। দুটোর জন্যে অর্থ ব্যয়ে কার্পণ্য নেই। ঋণ করে জমি বেচেও কিনতে অসুবিধে নেই। আগে গ্রামের স্বল্প আয়ের যুবক বিয়ের সময় চাইত যৌতুক— সাইকেল। এখনও চায়। তবে সাইকেলের আগে 'মোটর' শব্দটা যোগ হয়ে গেছে।

মোটর বাইক ছুটছে সর্বত্র। একইরকম ছবি। প্রচারে বলা হয়, তারুণ্যের প্রতীক মোটর সাইকেল। নানারকম বিজ্ঞাপন। গতির আর সুবিধার কথা ফলাও করে বলা। কোথাও বলা হয় না, 'অসতর্ক চালকের পক্ষে মোটর সাইকেল ব্যবহার বিপজ্জনক।' তাহলে বিক্রি ঘা খেতে পারে? মোটর বাইকের সঙ্গে বিপদের সম্ভাবনা জড়ানো— এটা জেনেশুনেই তো এত বিক্রি। অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস সর্বত্র যায়নি, মোবাইল ফোন আর মোটর বাইক গেছে। প্রয়োজন ছাড়া অনেকে কিনছেন। শো-রুমগুলোতে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ধারাবাহিক বিক্রি, ক্রমবর্ধমান চাহিদা সামলাতে হিমসিম খাওয়ার পর্ব চলে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দলীয় দাপট দেখানোর সঙ্গে আগে সাইকেল মিছিল করত। এখন তো সাইকেলের সংখ্যা কম। আর সাইকেল অনভিজাত ব্যাপার। মোটর বাইক বাহিনীর মিছিলে দুটো লাভ। (১) দাপট দেখানো যায়, (২) ত্রাস সৃষ্টির দারুণ পদ্ধতি। বিভিন্ন জেলায় কিছুকাল আগেও সিপিএম দল ওইভাবে লাল পতাকা নিয়ে মিছিল করত। জেনারেল বৈদ্যর উপর রাগ ছিল উগ্রপন্থীদের। অবসর নেওয়ার পর বাজারে বেরিয়েছিলেন। স্ত্রী গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তিনি পাশে। মোটর বাইকে চালকের পিছনে বসে থাকা ঘাতক নির্ভুল নিশানায় জেনারেল বৈদ্যকে গুলি করে। মোটর সাইকেল আর দুই আরোহী উধাও হয়ে যায় মুহূর্তে। ধরা পড়েনি। এরকম আকছার ঘটেছে। জাতীয় সড়কে গুণ্ডারা মোটর বাইক ছিনতাই করে তা পাচার করেছে অন্যদেশে। শোনা যেত সে দেশে এসব মোটর বাইকের ইঞ্জিন দেশি নৌকাতে লাগানো হোত।

কদিন আগে একটা খবর আমাদের যথেষ্ট বিচলিত করেছে। একদল স্কুল ছাত্র আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের উড়ালপুলের উপর স্কুল ছুটির পর বেপরোয়া উল্লাসে বাইকের দৌড় লাগায়। মাঝে মাঝে আছড়ে পড়ে। সেদিন গুরুতর ব্যাপার ঘটেছিল। পুলিশ একটু নড়েচড়ে বসে। অনেক রকম কড়াকড়ি হবে ঘোষণা করে। কিন্তু কোথায় কি! দিব্যি চলেছে মোটর সাইকেলের দৌড়।

মোটর বাইক নিয়ে সাতকাহন গাওয়া যেতে পারে বারবার। কারণ এর সঙ্গে গতি আর দুর্গতি দুই-ই জড়িয়ে আছে ওই যন্ত্রের সঙ্গে। সার্কাসে মোটর বাইক লাফ দেখতে ভালো লাগে। ভালো লাগে তারে বৃত্তের মধ্যে মোটর বাইক চালানো। ভালো লাগে ফৌজি লোকদের মোটর বাইকে নানারকম কসরত দেখানো। কিন্তু বেপরোয়া ভঙ্গিতে মোটর বাইক চালাতে গেলে বিপদ এড়ানো অনেক সময় সম্ভব হলেও চোখের যখন ভুল হয় তখন কিছুই করার থাকে না। হয় জীবন যায়, নয়তো মোটর বাইক চড়ার সাধ চিরতরে বন্ধ করা ছাড়া উপায় থাকে না। তবু গতি চাই। উদ্দাম উল্লাসে মেতে ওঠার মাশুল তো মাঝে মাঝে দিতে হবেই।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
12 September - 2011

দাম : ৫.০০ টাকা